২৪তম কংগ্রেস

রাজনৈতিক প্রস্তাব

(মাদুরাই ২-৬ এপ্রিল ২০২৫)

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)

প্রকাশ : ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

প্রকাশক
সুখেন্দু পাণিগ্রাহী
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি
৩১ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০ ০১৬

মুদ্রক
বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়
গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০১৬

দাম : ১০ টাকা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
২৪তম কংগ্রেসের
রাজনৈতিক প্রস্তাব

ভূমিকা

০.১ ২৩তম কংগ্রেসের পরবর্তী সময়ে, হিন্দুত্ব কর্পোরেট শাসনের শক্তি, মোদী সরকার যার প্রতি প্রতিনিধিত্ব করছে, এবং এর বিপরীতে ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক শক্তি, এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব ক্রমাগত বাড়ছে। প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দুত্বের এজেন্ডা চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা এবং বিরোধী শক্তি ও গণতন্ত্রকে অবদমিত করার জন্য কর্তৃত্ববাদী পদক্ষেপ নয়া-ফ্যাসিবাদী (নিও ফ্যাসিস্ত) বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত করছে। সিপিআই(এম) এবং বাম দলগুলি ধারাবাহিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রদায়িক-কর্পোরেট নীতির বিরোধিতা করে আসছে। শ্রমিক, কৃষক এবং অন্যান্য অংশের শ্রমজীবি মানুষ তাদের জীবন-জীবিকা ও অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষার জন্য এই সময়ে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তুলেছেন।

০.২ ২০২৪ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে বিজেপি একটা ধাক্কা খায়। তারা লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায় এবং সংসদে শক্তিশালী বিরোধীদের মুখোমুখি হয়। তবে, মোদী সরকারের তৃতীয়বারের মেয়াদেও বিজেপি-আরএসএসের হিন্দুত্ববাদী নয়া উদারবাদের এজেন্ডার ধারাবাহিকতা দেখা যাচ্ছে। নির্বাচনের ফলাফল মোদী সরকারের কর্পোরেটমুখী হিন্দুত্ববাদী নীতির বিরুদ্ধে সংসদের বাইরে এবং ভিতরে ব্যাপক প্রতিরোধের সুযোগ করে দিয়েছে।

০.৩ বিগত তিন বছরে মোদী সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক জোরদার করেছে সামরিক সহযোগিতার জন্য মৌলিক চুক্তিগুলি সম্পাদিত হয়েছে এবং এগুলি এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ক্রমাগত মার্কিন ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থের অনুসারী হয়েছে, যা কোয়াডে (QUAD) অংশগ্রহণ এবং গাজায় ইজরায়েলের গণহত্যাকারী যুদ্ধে নির্লজ্জ সমর্থন দেওয়ার মধ্যে দেখা যায়। এই সব ঘটনাকে অবশ্যই বিশ্বব্যাপী পরিবর্তন ও ভূ-রাজনৈতিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটেই বিচার করতে হবে। এগুলি ভারতের জাতীয় পরিস্থিতির ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলছে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

১.১ ২৩তম কংগ্রেসের পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ক্ষেত্রে যে প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয়েছে :

(i) ২৩তম কংগ্রেসের পরবর্তীতে বিশ্বে ঘটমান দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংঘাতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যুক্ত। এরা গাজার বিরুদ্ধে আগ্রাসনে ইজরায়েলকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করছে, যার ফলে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন এবং রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে ইউক্রেনকে প্রাণঘাতী অস্ত্র যোগাচ্ছে ও সমর্থন করছে।

(ii) ব্যবস্থাগত সংকটের ফলস্বরূপ বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্থর বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে। অসাম্য, দারিদ্র্য, বেকারি, ক্ষুধা ও অপুষ্টি ক্রমাগত বাড়ছে।

(iii) উন্নত দেশগুলিসহ বহু দেশে, অধিকার রক্ষার স্বার্থে এবং অর্থনৈতিক দুর্ভোগের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রাম চলছে।

(iv) রাজনীতির দক্ষিণপন্থী সরণ, যা আগেই প্রত্যক্ষ করা গেছে, তা অব্যাহত আছে। অনেক দেশই ক্ষমতার আসনে অতি দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলিকে নির্বাচন প্রত্যক্ষ করছে। তবে এই সময়ে বামপন্থীরা কলম্বিয়া, ব্রাজিল, মেক্সিকো, উরুগুয়ে এবং শ্রীলঙ্কায় অগ্রগতি ঘটিয়েছে।

(v) যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্রতর হচ্ছে।

(vi) সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করছে।

(vii) সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সর্বত্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে।

(viii) জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় সরকারগুলির প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থতা জলবায়ুকে মারাত্মক পরিবর্তনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং জনগণের, বিশেষ করে গ্লোবাল সাউথের জনগণের প্রভূত ক্ষতি করছে।

(ix) এই সময়কালে আমাদের প্রতিবেশি দেশগুলিতে তীব্র গণপ্রতিবাদ দেখা গেছে, যার ফলে নির্বাচিত সরকারগুলির পতন ঘটেছে।

(x) প্রতিবেশিদের সঙ্গে ভারতের বিচ্ছিন্নতা অব্যাহত আছে।

প্যালেস্তাইনে ইজরায়েলী গণহত্যা

১.২ ২০২৩ সালের ৭ই অক্টোবর হামাসের আক্রমণের পর ইজরায়েল টানা পনেরো মাস ধরে গাজায় গণহত্যাকারী আক্রমণ চালিয়ে যায়। যুদ্ধবিরতি ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত ইজরায়েলের নৃশংস আক্রমণে ৪৭০৩৫ জন প্যালেস্তিনীয় নিহত হন এবং এক লক্ষ আহত হন। নিহতদের প্রায় ৬০ শতাংশই নারী ও শিশু। সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে ইজরায়েল স্কুল, হাসপাতাল, জাতি সংঘের (UN) শরণার্থী শিবির এবং নিরস্ত্র অসামরিক নাগরিকদের ওপর আক্রমণ চালায়। ড্রোন, নিষিদ্ধ অস্ত্র ব্যবহার করে এবং টার্গেট করে হত্যাকাণ্ড চালায়। মার্কিন প্রশাসন ও তার মিত্রদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইজরায়েল ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক দখল করতে চায়।

১.৩ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের কারণেই ইজরায়েল প্যালেস্তাইনকে ধ্বংস করতে ও পশ্চিম এশিয়ার অনেক দেশে আক্রমণ সংগঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। ২০২৩ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইজরায়েলে অস্ত্র রপ্তানি বাড়িয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সহায়তাও পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ৩.৬ বিলিয়ন ডলার থেকে ১৭.৯ বিলিয়ন ডলার। অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবিতে জাতি সংঘে (UN) আনা সমস্ত প্রস্তাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভেটো দেয়। তারা ইজরায়েলের সঙ্গে একযোগে আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতকে (ICJ) উপেক্ষা করে, যারা ইজরায়েলের পদক্ষেপকে গণহত্যার লক্ষ্যে পরিচালিত বলে রায় দিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ, এই সংঘাত থেকে একটি শক্তিশালী ইজরায়েলের উত্থানকে সুনিশ্চিত করা, কারণ তা পশ্চিম এশিয়ায় তার আধিপত্য বজায় রাখা নিশ্চিত করবে।

১.৪ ইজরায়েল সংঘাতের এলাকা প্রসারিত করে লেবাননেও আক্রমণ করে, যেখানে যুদ্ধবিরতি ঘোষণার আগে পর্যন্ত ৩৭০০ জন নিহত হয়েছেন। তারা সিরিয়া, ইয়েমেন, ইরান ও ইরাকে বোমা হামলা চালিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য ইজরায়েলের ইয়েমেন আক্রমণে যোগ দেয় এবং ইরানের ওপর আক্রমণকে সমর্থন করে। শীর্ষস্থানীয় ইরানি জেনারেলদের ইরান ও সিরিয়ার অভ্যন্তরে হত্যা করা হয়।

১.৫ গাজায় ইজরায়েলের হামলা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়েছে যুদ্ধবিরতি ঘোষণার মধ্য দিয়ে, যা তিনটি পর্যায়ে প্রয়োগ করা হবে। যুদ্ধবিরতি ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ইজরায়েল ঘোষণা করে যে তাদের যে কোন সময় গাজায় আক্রমণের অধিকার রয়েছে। এটা যুদ্ধবিরতি চুক্তির অন্তঃসারশূন্যতাকেই উন্মোচিত করে।

সিরিয়া : আসাদের পতন

১.৬ সিরিয়ায় বাশার-আল-আসাদ জমানার পতন বড় প্রভাব ফেলবে। পশ্চিম এশিয়ার শেষ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রটির অবসান এই অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে তুলবে এবং সাম্প্রদায়িক বিরোধ বৃদ্ধি পাবে। আসাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হামলায় নেতৃত্বদানকারী ইসলামপন্থী হায়াত তাহরির আল-শাম (HTS) সরকার গঠন করেছে। এরা বিভিন্ন ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেও, বাস্তব চিত্র আলাদা, সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণের খবর আসছে। অনেকেই আবার হামলার আশঙ্কায় সিরিয়া ছেড়ে যাচ্ছে। HTS, ইজরায়েল এবং তুরস্ক সিরিয়াকে তাদের নিজ নিজ প্রভাবের বলয়ে ভাগ করার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। ইজরায়েল গোলান মালভূমিতে বাফার জোন অতিক্রম করে তার সৈন্য মোতায়েন করেছে। তুরস্ক সীমান্ত অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করতে চায় যাতে কুর্দিদের দমন সুনিশ্চিত করা যায়। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা, যারা কুর্দিদের সমর্থন করছিল, তারা নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ পূরণের লক্ষ্যে HTS-এর সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির পক্ষে বিপজ্জনক ধর্মীয় মৌলবাদী

ও উগ্রপন্থী শক্তিগুলিকে মদত যোগানোর মার্কিনী ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এটি আদৌ অপ্রত্যাশিত নয়।

ইউক্রেনে যুদ্ধ

১.৭ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে উভয় পক্ষের আক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে রাশিয়ার ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেয়। রাশিয়া ঘোষণা করে যে তারা এই ধরনের আক্রমণকে NATO দেশগুলির সরাসরি আক্রমণ বলে বিবেচনা করছে এবং পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি দেয়। অস্ত্রশস্ত্র এবং অর্থের দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও NATO-র সমস্ত সহায়তা পাওয়া সত্ত্বেও, রাশিয়ানদের পূর্ব ইউক্রেন থেকে পিছু হটাতে বা এমনকি নিজেদের ফ্রন্টলাইন অবস্থান ধরে রাখতেও ইউক্রেন অসমর্থ হয়। রাশিয়া ডনবাসে তার আঞ্চলিক দখল বাড়িয়েছে এবং ইউক্রেনের পূর্ব অঞ্চলে ক্রমাগত অগ্রসর হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়াকে দুর্বল ও অবরোধ করার লক্ষ্যে ইউক্রেনকে ব্যবহার করছে।

১.৮ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের দ্বারা রাশিয়ার ওপর আরোপিত সমস্ত অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা রাশিয়ার অর্থনীতিকে পঙ্গু করতে ব্যর্থ হয়েছে। অনেক উন্নয়নশীল দেশ, বিশেষ করে চীন ও ভারতের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও বাণিজ্যের কারণে রাশিয়া নিষেধাজ্ঞার জাল ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। স্থানীয় মুদ্রায় বাণিজ্য এবং সস্তা জ্বালানি সরবরাহ রাশিয়াকে তার বাজারের অংশ ধরে রাখতে এবং নিষেধাজ্ঞার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে সক্ষম করেছে। এই বিষয়গুলি, রাশিয়ার মতো একটি বৃহৎ অর্থনীতিকে প্রতিহত করার জন্য অস্ত্র হিসাবে নিষেধাজ্ঞার ব্যর্থতাকেই প্রকাশ করে। অন্যদিকে, রাশিয়া থেকে জ্বালানি কেনার ওপর নিষেধাজ্ঞা ইউরোপীয় দেশগুলিকে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। গ্যাস ও খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে মানুষের উপর বোঝা আরও বেড়েছে।

এশিয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে উত্তেজনা বাড়ছে

১.৯ চীনকে অবরুদ্ধ ও বিচ্ছিন্ন করার প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এশিয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তার নৌবহর ও সামরিক মহড়া বৃদ্ধি করে উত্তেজনা তৈরি করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলের দেশগুলির সঙ্গে তার সামরিক জোট (প্রতিরক্ষা চুক্তি) শক্তিশালী করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই অঞ্চলে একটি নতুন, আক্রমণাত্মক মাঝারি পাল্লার স্থলভিত্তিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা মোতায়েন করতে শুরু করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানকে অস্ত্র দিয়ে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে খোলাখুলি মদত যুগিয়ে চীনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নির্জজ্জভাবে হস্তক্ষেপ করছে।

১.১০ **কোরিয়ান উপদ্বীপ :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্ররোচনায় কোরিয়ান উপদ্বীপ অঞ্চলের

পরিস্থিতি ক্রমাগত অস্থির হয়ে উঠছে, যা এখানকার নিরাপত্তাকে গুরুতরভাবে প্রভাবিত করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়া ত্রিপাক্ষিক সামরিক সহযোগিতা জোরদার করেছে এবং প্রবলভাবে যৌথ সামরিক মহড়া পরিচালনা করছে। উত্তর কোরিয়া (DPRK) দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে সম্পর্কের প্রশ্নে তার নীতি পরিবর্তন করেছে। ঘোষণা করেছে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া আর একই জাতির মানুষ নয় এবং শত্রু ও যুদ্ধরত দুটি পক্ষ। দুই পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক, ইতিহাসের বিচারে, সবচেয়ে তলানিতে নেমে এসেছে।

১.১১ এই অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য স্পষ্টতই চীন, রাশিয়া এবং উত্তর কোরিয়া যাদের আনুষ্ঠানিকভাবে 'সংশোধনবাদী শক্তি' (চীন), 'ক্ষতিকর রাষ্ট্র' (রাশিয়া) এবং 'দুষ্ট রাষ্ট্র' (DPRK) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১.১২ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার অর্থনীতি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও, সমগ্র বিশ্বে তার আধিপত্য চাপিয়ে দিতে চাইছে। ইউক্রেন ও পশ্চিম এশিয়ার প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক পরাক্রমের সীমাবদ্ধতা দেখা গেছে। অন্যদিকে, রাশিয়া ও চীনের মধ্যে দৃঢ় অংশীদারিত্ব এবং অনেক উন্নয়নশীল দেশের তাদের পিছনে সামিল হওয়া, মার্কিন প্রতিরক্ষার দুর্বলতাকে আরও উন্মোচিত করেছে। রাশিয়া ও চীনের ক্রমবর্ধমান সমঝোতাকে প্রতিহত করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র G-7 এবং NATO-র মতো জোটকে শক্তিশালী করছে এবং নতুন নতুন জোট গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। সমগ্র বিশ্বকে ধীরে ধীরে দুটি বিবদমান গোষ্ঠীর দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, যা আরেকটি ঠাণ্ডা যুদ্ধের সূচনা করছে।

১.১৩ ২৩তম কংগ্রেসে আমরা লক্ষ্য করেছি, মার্কিন প্রশাসন রাশিয়া ও চীনের বিরুদ্ধে তার মিত্রদের একজোট করার চেষ্টা করলেও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে মতপার্থক্য রয়ে গেছে। এই সময়কালে NATO এবং G-7-কে কাজে লাগিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া ও চীনের বিরুদ্ধে তার মিত্রদের একত্রিত করতে এবং বিরোধ মেটানোর লক্ষ্যে এগোতে সমর্থ হয়েছে। NATO এবং G-7 উভয়েই ঘোষণা করেছে চীন ও রাশিয়া 'উদ্বেগের দেশ' যাদের অবরোধ করা প্রয়োজন। ফলে আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বগুলি স্তিমিত রয়েছে। ট্রাম্প মার্কিন রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণের সাথে সাথে তাঁর জলবায়ু পরিবর্তন, ইউরোপীয় জোট এবং NATO সম্পর্কিত নীতিগুলির কারণে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে আবার চাপ তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে।

সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি

১.১৪ ২০২৩ সালে বিশ্বব্যাপী সামরিক ব্যয় একটানা বৃদ্ধি পেয়ে নবম বছরে ২.৪৪ ট্রিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও প্রতিরক্ষায় বৃহত্তম ব্যয়কারী এবং তার NATO মিত্রদের সাথে একত্রে বিশ্বব্যাপী সামরিক ব্যয়ের অর্ধেকেরও বেশি ব্যয় বহন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেয়াদ-উত্তীর্ণ পারমাণবিক প্রতিরোধ

চুক্তিতে পুনরায় স্বাক্ষর করতে অনিচ্ছুক। ইউক্রেনে যুদ্ধের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে সর্বশেষ পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি 'নিউ স্ট্র্যাটেজিক আর্মস রিডাকশন ট্রিটি' (New START) স্থগিত রয়েছে। বিভিন্ন অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়া এবং নতুন গণবিধ্বংসী অস্ত্র তৈরিতে ব্যয় বৃদ্ধি সমগ্র বিশ্বকে বিপদের মুখে ফেলছে।

১.১৫ আফ্রিকা মহাদেশে সামরিক অভ্যুত্থান এবং অভ্যন্তরীণ সংঘাত বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। ২০২২ সাল থেকে আফ্রিকায় আটটি অভ্যুত্থান হয়েছে, যার মধ্যে তিনটি সফল হয়েছে। সংঘাত ও সামাজিক অস্থিরতার কারণে ৪৫ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। সাহেল অঞ্চলের সংলগ্ন অঞ্চল গঠনকারী ১৫টি দেশ, গ্রেট লেকস অ্যান্ড হর্ন অফ আফ্রিকা প্রধানত এই সংঘাতগুলির দ্বারা আক্রান্ত হয়। এদের মধ্যে সুদান সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত, যেখানে ভয়ানক গৃহযুদ্ধ চলছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার মিলিটারি কম্যান্ড সেন্টার AFRICOM-এর মাধ্যমে আফ্রিকার অনেক দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ অব্যাহত রেখেছে। বিগত তিন বছরে ফ্রান্স তার পূর্বতন উপনিবেশগুলি যেমন – মালি, বুর্কিনা ফাসো, নাইজার, চাদ, সেনেগাল এবং আইভরি কোস্ট থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে। জনগণ তাদের নিজ দেশে অবস্থানরত বিদেশী সেনা প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ করছে। আফ্রিকার অনেক দেশ তাদের সম্পর্ককে বিস্তৃত করতে চায়, যা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অপছন্দ।

১.১৬ **জাতি সংঘের (UN) ভূমিকা** : গাজা, ইউক্রেন, সুদান, কঙ্গো ইত্যাদিতে যে ভয়ানক হিংসাত্মক সংঘাত আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, জাতি সংঘ (UN) তা বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে প্রকৃত ক্ষমতা তাদের হাতেই রয়েছে যারা রাজনৈতিক, সামরিক, আর্থিক এবং ভেটো ক্ষমতা ব্যবহার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইজরায়েলের মতো দেশগুলি যা ইচ্ছে তাই করছে। তারা জাতি সংঘের বাজেটে তাদের অংশ প্রদান করতে অস্বীকার করছে, এমনকি আন্তর্জাতিক আইন বজায় রাখার জন্য নিযুক্ত জাতি সংঘের সংস্থাগুলিকেও নিষিদ্ধ করছে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে জাতি সংঘের ব্যর্থতা আসলে তার সদস্যদের মধ্যে শক্তির অসমতার প্রকাশ। এর জন্য জাতি সংঘ এবং এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গণতন্ত্রীকরণের প্রয়োজন জরুরী।

১.১৭ **বহু-মেরুর দিকে অগ্রসর হওয়া** : বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাঁচ নতুন সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করে BRICS সম্প্রসারিত হয়েছে। নতুন উদ্ভূত ব্রিকস প্লাস (BRICS Plus) বিশ্ব জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি এবং গ্লোবাল জিডিপি-র ৩৭ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করছে। এই দেশগুলি তাদের নিজস্ব জাতীয় মুদ্রায় বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এইভাবে বাণিজ্যে ডলার নির্ভরতা হ্রাস করছে। এটি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার ডলার আধিপত্যের ওপর

একটি আঘাত। অনেক দেশ এই গোষ্ঠীতে যোগদানের আগ্রহ দেখাচ্ছে এবং সদস্য হওয়ার আবেদন করছে। 'ব্রিকস'-কে আরও সম্প্রসারিত করার পদক্ষেপ হিসাবে এই ধরনের কিছু দেশকে 'অংশীদার রাষ্ট্র' হিসাবে যুক্ত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। BRICS কোনও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মঞ্চ নয়, তবে একটি বহু পাক্ষিক মঞ্চ হিসাবে উঠে আসতে পারে যা মার্কিন নেতৃত্বাধীন একমেরুকরণকে চ্যালেঞ্জ জানাতে এবং বহুমেরুকরণকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করতে পারে।

বিশ্ব অর্থনীতি

১.১৮ বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি নতুন স্বাভাবিক অবস্থার (New Normal) সূচনা হয়েছে, যার বৈশিষ্ট্য হল মন্থর প্রবৃদ্ধি। আই এম এফের মতে, ২০২৪ এবং ২০২৫ সালে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৩.২ শতাংশে স্থিতিশীল থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই হারগুলি উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় অর্থনীতির জন্যই অতিমারীর আগের বছরগুলিতে নির্ধারিত হারের চেয়ে কম এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, উন্নয়নমূলক ও পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অপ্রতুল। এই প্রবণতা, বিশেষ করে ৪৬টি স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে উদ্বেগজনক এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ৭ শতাংশের তুলনায় দুঃখজনকভাবে কম।

১.১৯ **মূল্যবৃদ্ধি এবং ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস :** বিশ্বজুড়ে মানুষের কাছে মুদ্রাস্ফীতি একটি প্রধান উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০২৪ সালে বিশ্বব্যাপী ভোক্তা মূল্য (Consumer Prices) ৪.৩ শতাংশ বেড়েছে। ক্রমবর্ধমান ভোক্তা মূল্য উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় দেশগুলিতেই ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস করেছে। ২০২৩ সালে খাদ্যপণ্যের দাম বেশি ছিল এবং একমাত্র ২০২৩ সালের ডিসেম্বরেই UNCTAD খাদ্য সূচক তার ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির স্তরের নিচে নেমে আসে। এমনকি এটিও ছিল প্রাক্-অতিমারী স্তরের থেকে প্রায় ২০ শতাংশ বেশি। কৃষি পণ্যের দাম, যেমন তৈলবীজ ও তেলের দামও একই ধরনের ওঠানামা অনুভব করেছে, যেখানে চালের দাম ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির স্তরের নিচে নেমে যায়নি। সারের দামও প্রাক্-অতিমারী স্তরের ওপরে বেড়েছে।

১.২০ ইউক্রেনের মতো আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব, ক্রমবর্ধমান পণ্যমূল্য, বাজার ঘনত্ব বৃদ্ধি এবং বৃহৎ কর্পোরেশনগুলির বিশেষত কৃষিখাদ্য ও শক্তি কর্পোরেশনগুলির মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি ও ভোক্তাদের আচরণ ইত্যাদি নানা কারণের ফলে মুদ্রাস্ফীতির বৃদ্ধি ঘটছে। প্রতিযোগিতা বিরোধী কার্যকলাপ, প্রভাবশালী বাজার-অবস্থানের অপব্যবহার এবং মূল ক্ষেত্রগুলিতে কর্পোরেট কেন্দ্রিকরণের বিরুদ্ধে লাগাম টানতে না পারলে, পাশাপাশি কৃষিপণ্যে ফাটকাবাজি রোধ করার পদক্ষেপ না নেওয়া পর্যন্ত উচ্চ পণ্যমূল্য থেকে কোনও স্বস্তি পাওয়া যাবে না।

১.২১ **শ্রমিকশ্রেণির উপর আক্রমণ :** পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব শ্রমিকশ্রেণি

মারাত্মকভাবে অনুভব করছে, কারণ তাদের প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পায়নি। মোট ৭৯১ মিলিয়ন শ্রমিক অনুভব করছে তাদের মজুরি মুদ্রাস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে, ফলস্বরূপ গত দুই বছরে তারা ১.৫ ট্রিলিয়ন ডলার হারিয়েছে, যা প্রত্যেক শ্রমিকের প্রায় এক মাস (২৫ দিন) হারানো মজুরির সমতুল্য। মজুরি হ্রাস প্রতিফলিত হচ্ছে ক্রমহ্রাসমান শ্রম আয়ের অংশেও, যা বিশ্বব্যাপী ০.৬ শতাংশ কমে ২০১৯ সালে ৫২.৯ শতাংশ থেকে ২০২২ সালে ৫২.৩ শতাংশে নেমে এসেছে এবং এরপর থেকে শ্রম আয়ের অংশ একই রয়েছে। শতাংশ পয়েন্টের দিক থেকে হ্রাসটিকে পরিমিত মনে হলেও, এটি, ২০০৪ সাল থেকে শ্রম আয়ের অংশ স্থিতিশীল থাকলে শ্রমিকরা যা উপার্জন করত তার তুলনায় ২০২৪ সালে শ্রম আয়ের বার্ষিক ঘাটতি ২-৪ ট্রিলিয়ন ডলার [Purchasing Power Parity (PPP) স্থির ধরে] তা প্রকাশ করছে। লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে নারী শ্রমিকরা মজুরির ক্ষেত্রে আরও বেশি দুর্ভোগের সম্মুখীন হচ্ছে। যথা, একজন পুরুষের প্রতি ডলার রোজগারের জন্য নারীরা মাত্র ৫১.৮ সেন্ট উপার্জন করছেন।

১.২২ উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় অর্থনীতিতেই শ্রমের অংশ হ্রাস পাওয়া এবং একই সাথে পিরামিডের উপরের দিকে আয়ের ঘনত্ব বৃদ্ধি, এই সত্যের দিকেই ইঙ্গিত করছে যে নিচের দিকের লোকেরা শ্রমের অংশ হ্রাসের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি স্বীকার করছে। এটাই ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের প্রধান কারণ এবং এর ফলে পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে উঠছে।

১.২৩ **ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব :** সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিশ্বে বেকারত্বের হার প্রায় ৫ শতাংশ। এর সাথে ২০২৪ সালে অতিরিক্ত দুই মিলিয়ন শ্রমিক তাদের কাজ হারিয়েছে। বিশ্বে যুব বেকারত্বের হার ২০২৩ সালে ১৩ শতাংশ যা ৬৪.৯ মিলিয়ন। কাজ পাওয়া যুবদের প্রায় পাঁচ ভাগের চার ভাগ (চার-পঞ্চমাংশ) কম নিযুক্ত, অনিরাপদ কাজে যুক্ত, ক্যাজুয়াল কর্মী বা উপযুক্ত বেতন পায় না। এমনকি এক-পঞ্চমাংশের মধ্যেও অনেকে চুক্তিভিত্তিক কাজে নিযুক্ত। ২০২৪ সালে পৃথিবীতে ২০.৪ শতাংশ যুব কর্মসংস্থান, শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ (NEET) কোন কিছুতেই নেই। পৃথিবীতে ২৭.৬ মিলিয়ন লোক বেগার শ্রম দেয়, যার থেকে পুঁজিপতিরা বছরে ২৩৬ ডলার মুনাফা অর্জন করে। বাধ্যতামূলক শ্রমের ৮৬ শতাংশ বেসরকারি ক্ষেত্রে রয়েছে। একথা স্পষ্ট যে, পুঁজি কম মজুরিতে শ্রম চায় এবং শ্রমিকদের সেই ধরনের শ্রমদানে নিযুক্ত করে যা থেকে সমস্ত শ্রমশক্তিকে নিষ্পেষণ করা যায়।

১.২৪ **ব্যাপক অসাম্য :** ২০২৩ সালের হিসাব অনুসারে, পৃথিবীতে তিন বিলিয়নেরও বেশি মানুষ, যা বিশ্ব জনসংখ্যার প্রায় ৪৬ শতাংশ, বিশ্ব দারিদ্র্যসীমার [প্রতিদিন ৬.৮৫ ডলার (2017 purchase power parity)] নিচে বাস করছে। বিগত ২৫ বছরে এই প্রথম গ্লোবাল নর্থ ও গ্লোবাল সাউথের মধ্যে ব্যবধান বেড়েছে। বিশ্বে

প্রায় ৭০০ মিলিয়ন মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে, মাথাপিছু প্রতিদিন ২.১৫ ডলারের কম খরচে বেঁচে থাকে। ২০২৩ সালে, বিশ্বের জনসংখ্যার ১০.৭ শতাংশ (৮৬৪.১ মিলিয়ন) গুরুতর খাদ্য নিরাপত্তার অভাবে ভুগছে। জলবায়ু বিপর্যয়ের কারণেও বিশ্বব্যাপী বৈষম্য বৃদ্ধি ঘটছে।

১.২৫ **একচেটিয়ায় সম্পদের কেন্দ্রিভবন** : এই সময়ে উদ্বেগজনক গতিতে সম্পদের কেন্দ্রিভবন ঘটছে। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ১ শতাংশের কাছে ৯৫% মানুষের চেয়ে বেশি সম্পদ আছে। ২০২০ সাল থেকে, সবচেয়ে ধনী ১ শতাংশ সমস্ত নতুন সম্পদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কবজা করেছে – যা বিশ্বের জনসংখ্যার নিচের ৯৯ শতাংশের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ অর্থ। বিলিয়নিয়ারদের ভাগ্যে প্রতিদিন ২.৭ বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পাচ্ছে, এমন কি যখন মুদ্রাস্ফীতি কম পক্ষে ১.৭ বিলিয়ন শ্রমিকের মজুরি ছাড়িয়ে যায়।

১.২৬ সম্পদের বিপুল কেন্দ্রিভবন ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রিভূত একচেটিয়া ক্ষমতার সাথে গভীরভাবে জড়িত। ফার্মাসিউটিক্যালস, কৃষি এবং প্রযুক্তিসহ অল্প কয়েকটি সংস্থা বিশ্বজুড়ে মূল বাজারগুলিতে আধিপত্য করছে। শীর্ষ সাতটি সোস্যাল মিডিয়া, প্রযুক্তি এবং চিপ কোম্পানির বাজার মূল্য যেখানে প্রায় ১২ ট্রিলিয়ন ডলার, সেখানে অন্য ৪৯৩টি কোম্পানি স্থবিরতা ও ক্ষয়ের শিকার। একচেটিয়ার এই ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা লবিং, রাজনৈতিক অনুদান, আইনি চ্যালেঞ্জ, গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ, বিনিয়োগ সরিয়ে নেওয়ার হুমকি ইত্যাদির মাধ্যমে নয়া উদারনীতি কার্যকর করার জন্য সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করতে ব্যবহৃত হয়। কর্পোরেট কর হ্রাস করে, শ্রম সুরক্ষা দুর্বল করে, সরকারি পরিষেবার বেসরকারিকরণ করে এবং ব্যয় সংকোচন নীতি চাপিয়ে সরকারগুলি কর্পোরেট স্বার্থকে সুরক্ষিত করছে। নয়া উদারনীতি কেবল অর্থনৈতিক বৈষম্যই বাড়ায় না, একই সাথে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকেও দুর্বল করে যা উদার গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতাকে উন্মোচিত করেছে।

১.২৭ **গুরুতর ঋণ সংকট** : ২০২৪ সালের হিসাবে ৫৪টি দেশ ঋণ সংকটে রয়েছে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে উন্নত দেশগুলিতে বছরে গড়ে ৭০০ বিলিয়ন ডলার নেট সম্পদ স্থানান্তরিত হচ্ছে। শুধুমাত্র গত তিন বছরে, শ্রীলঙ্কা সহ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ১৮টি সার্বভৌম খেলাপি হয়েছে, যা আগের দুই দশকের তুলনায় বেশি। অনেক দেশের সার্বভৌম ঋণ সঙ্কটের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বেসরকারি ঋণদাতাদের ক্রমবর্ধমান প্রাধান্য। নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলির বৈদেশিক ঋণের অর্ধেকেরও বেশি ব্যাঙ্ক এবং হেজ ফান্ডের মতো বেসরকারি ঋণদাতাদের কাছে রয়েছে। ২০২২ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলি তাদের বিতরণে প্রাপ্ত অর্থের চেয়ে প্রায় ৯০ বিলিয়ন ডলার বেশি অর্থ বহিরাগত বেসরকারি ঋণদাতাদের প্রদান করেছে।

১.২৮ আই এম এফ-এর মতো আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির (IFIs) দ্বারা

আরোপিত ক্ষতিকারক ঋণের শর্তাবলী এবং উচ্চ সুদের হার ঋণ সংকটের অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে অন্যতম। এই ঋণগুলি অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে ধনী ও উন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে সম্পদ হস্তান্তরের একটি উপায়।

১.২৯ **কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা :** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) যন্ত্রগুলি ইদানিংকালে পাঠ্য, চিত্র এমনকি ভিডিও তৈরির মতো কাজগুলিতে তাৎপর্যপূর্ণ সক্ষমতা প্রদর্শন করেছে। মানুষের মতো নয়, এআই বিষয়গুলি না বুঝেও পরিসংখ্যানগত পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে বিষয়বস্তু নির্মাণ করে। এই সরঞ্জামগুলি/ব্যবস্থাগুলি আজ এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে প্রচুর সংখ্যক 'হোয়াইট কলার জব', যা মেশিনের ক্ষমতার বাইরে বলে মনে করা হত তা এখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে শ্রমজীবি মানুষকে অনেক ক্ষেত্রে তাদের চাকরির সংকটের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। এআই সিস্টেম পরিষেবা এবং সুবিধাগুলিতে অ্যাক্সেস পরিচালনা করতে নিযুক্ত করা হয় যা মানুষকে ছাড়াই মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণে উদ্বেগের জন্ম দিচ্ছে। এআই-কে অস্ত্রধারী করা হচ্ছে এবং যুদ্ধেও ব্যবহার করা হচ্ছে। বড় প্রযুক্তি সংস্থাগুলি আমাদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করে, যা গোপনীয়তা রক্ষার মৌলিক অধিকারকে লঙ্ঘন করে। মানুষের স্বার্থ ও তার অধিকার সুনিশ্চিত করার তাগিদেই এআই বিকাশের প্রশ্নে একটি শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জরুরী প্রয়োজন রয়েছে।

বিক্ষোভ বাড়ছে

১.৩০ ক্রমবর্ধমান বৈষম্য, বেকারত্ব এবং দারিদ্র্য ব্যাপক অসন্তোষ ও ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। ২০২২ সাল থেকে পর্তুগাল, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, কেনিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং গ্রীসের মতো উন্নত দেশগুলিতেও সংগ্রামের ঢেউ প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। বহু দেশে বিভিন্ন অংশের মানুষ এই বিক্ষোভগুলিতে যোগ দিয়েছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে প্রতিবাদ বিক্ষোভ কাঁপিয়ে দিয়েছে। বিভিন্ন দেশের শ্রমিক ও কৃষকরা অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় সরকারের ভূমিকা, সামাজিক বৈষম্য এবং রাজনৈতিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য বিক্ষোভ সংগঠিত করেছে। তারা ন্যায্য মজুরি, উন্নত কাজের পরিবেশ এবং বৃহত্তর অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের দাবি তুলেছে।

অতি দক্ষিণপন্থার বাড়বাড়ন্ত

১.৩১ মানুষের জীবনমানের অবনতির প্রশ্নে যথার্থ উদ্বেগকে কাজে লাগিয়ে নিও ফ্যাসিস্ত শক্তি এবং অতি দক্ষিণপন্থী দলগুলি কিছু দেশে তাদের জমি তৈরি করেছে। তারা বর্ণবাদ, বিদেশী বিদ্বেষ এবং অভিবাসন ভীতির মনোভাবকে

উস্কে দিয়ে লাভবান হয়েছে। একটি কার্যকর বাম রাজনৈতিক বিকল্পের অভাবে, জনগণের অসন্তোষকে অতি দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি, জনগণের সংগ্রামী ঐক্যকে (সংগ্রামের সময় দৃশ্যমান ঐক্যকে) বিভাজিত করতে ব্যবহার করছে। নয়া উদার নীতিকে বাস্তবায়িত করার জন্যে, প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলি, কি সোস্যাল ডেমোক্র্যাট, কি কনজারভেটিভ, উভয়ের বিরুদ্ধেই ক্ষোভ জনগণকে অতি দক্ষিণপন্থার দিকে ঠেলে দেয় এবং এটি অতি দক্ষিণপন্থী দলগুলির নির্বাচনী জয় নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। একবার ক্ষমতায় আসার পর এই দলগুলি কেবল নয়া-উদারনীতিই অনুসরণ করে না, বিভাজনের শক্তিকেও উৎসাহিতর করে, যা সামাজিক ঐক্যকে বিপন্ন করে তোলে। ২৩তম কংগ্রেসে রাজনীতির দক্ষিণপন্থী সরণ লক্ষ্য করা গেছিল, যা এখনো অব্যাহত আছে এবং একটি গুরুতর বিপদ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে।

১.৩২ মহামারী পরবর্তী সময় বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারগুলি অনেক দেশে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। সার্বজনীন ভোটাধিকার চালু হবার পর এই প্রথম উন্নত দেশগুলিতে সমস্ত ক্ষমতাসীন দলগুলি তাদের ভোটের ভাগ হারিয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এই নির্বাচনগুলি একটি ক্রমবর্ধমান বিভাজন ও মেরুকরণকে প্রতিফলিত করে যেখানে সোস্যাল ডেমোক্র্যাট, সেন্ট্রিস্ট ও গ্রীন পার্টিগুলি অতিদক্ষিণপন্থী শক্তির কাছে তাদের শক্তি হারায়।

১.৩৩ প্রগতিশীল শক্তিগুলি কলম্বিয়া, মেক্সিকো, ব্রাজিল, শ্রীলঙ্কা এবং উরুগুয়েতে নির্বাচনে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়, যেখানে মানুষ জনবিরোধী সরকারগুলির বিরুদ্ধে ভোট দেয়। যেখানেই বামপন্থীরা গণবিক্ষোভে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এবং প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক দলগুলির থেকে নিজেদের আলাদা করতে সক্ষম হয় সেখানেই তারা নির্বাচনী বিজয়ের মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন করতে এবং অতি দক্ষিণপন্থীদের অগ্রগতি প্রতিহত করতে সক্ষম হয়।

১.৩৪ তবে, বিশ্বের অন্যান্য অনেক অংশে, অতি দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি সরকারে নির্বাচিত হয়েছে। ইউরোপীয় সংসদের নির্বাচনে, অতি দক্ষিণপন্থী দলগুলি বেশ কয়েকটি দেশে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়েছিল। আর্জেন্টিনায় জেভিয়ার মিলেই, ইতালিতে জর্জিয়া মেলোনি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচন বিশ্বজুড়ে দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক সরণের প্রবণতাকে প্রতিফলিত করে। এটি অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ এবং পরিবেশ নীতির প্রশ্নে দ্বন্দ্বের এক সময়কালের সূচনা। ডোনাল্ড ট্রাম্প দায়িত্বগ্রহণের পরপরই তাঁর প্রশাসন পানামা থেকে পানামা খাল ফিরিয়ে নেবে এবং কিউবাকে আবার সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্রের তালিকায় রাখবে বলে ঘোষণা করে তিনি তাঁর আগ্রাসী ও সম্প্রসারণবাদী অভিপ্রায়গুলি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেন যে নতুন প্রশাসন চীনের মতো দেশের ওপর শুল্ক বৃদ্ধি করবে এবং বাণিজ্য যুদ্ধকে পুনরুজ্জীবিত করবে যা বিশ্ব অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলবে। ট্রাম্পের

প্রেসিডেন্সি যুদ্ধের অবসান ঘটাবে না, কারণ তিনি পুরোপুরি ইজরায়েলকে সমর্থন করেন এবং মার্কিন অর্থনৈতিক শক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে এমন যেকোনো দেশের উত্থানেরও বিরুদ্ধে। আন্তর্জাতিক চুক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি তাঁর অবজ্ঞা দেখিয়ে ট্রাম্প প্যারিস জলবায়ু চুক্তি এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাহারের ঘোষণা করেন। তিনি তাঁর অতি দক্ষিণপন্থী ঘরোয়া অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন নির্বাহী আদেশও জারি করেছেন।

জলবায়ু পরিবর্তন

১.৩৫ উন্নত দেশগুলির অতি দক্ষিণপন্থী দলগুলির অনেকেই যারা সরকারে নির্বাচিত হয়েছে তারা জলবায়ু পরিবর্তন অস্বীকার করে, যা জলবায়ু চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পদক্ষেপকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে। এই প্রথম জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৪, প্রায় বছরব্যাপী সময়কালে বিশ্বব্যাপী গড় তাপমাত্রা প্রাক্‌শিল্প গড়ের চেয়ে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার বেশি ছিল, যা বিশ্ব উষ্ণায়নকে সীমাবদ্ধ করার জন্য ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তিতে নির্ধারিত নিম্নসীমাকে লঙ্ঘন করে। শীর্ষ ১ শতাংশের CO_2 নির্গমণ বিশ্বের দরিদ্রতম দুই তৃতীয়াংশ বা পাঁচ বিলিয়ন মানুষের CO_2 নির্গমণের চেয়ে বেশি। অন্যদিকে, গ্লোবাল সাউথের দরিদ্র ও দুর্বলরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং হবেও।

১.৩৬ ধনী, উন্নত দেশগুলি, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই এবং পরিবেশ সুরক্ষায় ভূমিকা পালনে তাদের নিজস্ব দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত নয়। উন্নত দেশগুলি জীবাশ্ব জ্বালানির ব্যবহার অব্যাহত রেখেছে, ধীরে ধীরে সেগুলি হ্রাস করছে, যখন তারা উন্নয়নশীল দেশগুলিকে ব্যয়বহুল পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস গ্রহণ করতে বাধ্য করছে এবং তাদের শিল্পবিকাশ ও তাদের জনসংখ্যার জন্য ন্যায্য শক্তির ব্যবহারের সুযোগকে সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করছে। ২০২৪ সালে বাকুতে সমাপ্ত হওয়া COP 29-এ, উন্নত দেশগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য জলবায়ু অর্থায়ন (Climate finance) হিসাবে ২০৩৫ সালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ হবার জন্য মাত্র ৩০০ বিলিয়ন ডলারের প্রস্তাব দিয়েছে। এই তথাকথিত 'চুক্তি', কার্যত একটি যৎকিঞ্চিত বরাদ্দের ভিক্ষা যা দরিদ্র দেশগুলি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে এবং এটি আমাদের এই গ্রহ ও প্রজাতির জন্য একটি বিপর্যয় যারা বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে বন্যা, অনাহার ও বাস্তুচ্যুতির বিপদের সম্মুখীন। পর্যাপ্ত অর্থ সরবরাহের পরিবর্তে উন্নত দেশগুলি ক্ষুদ্র কৃষক এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাঁধে নির্গমণ হ্রাসের বোঝা চাপিয়ে প্রকৃতির আরও পণ্যকরণ করতে চায়। এমনকি বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তায় সামান্য অগ্রগতিও বিপদের মুছে পড়েছে কারণ জৈব জ্বালানি ও শক্তির জন্য ফসল উৎপাদনের পরিবর্তন, খাদ্য বা পুষ্টির জন্য উৎপাদনকে বাতিল করছে।

১.৩৭ শিল্পায়ন শুরু হবার পর থেকে বিশ্বব্যাপী সঞ্চিত নির্গমণের ৭৫ শতাংশেরও

বেশির জন্য দায়ী ধনী দেশগুলির দায়িত্ব রয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সাহায্য করা এবং জলবায়ু অভিযোজন, জলবায়ু বিপর্যয়ের প্রভাবে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির জন্য, উন্নয়নের জন্য, জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভরতা থেকে ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতিতে সরে এসে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ও জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা ভিত্তিক সমাজের জন্য অর্থপ্রদান করা। উন্নয়নশীল দেশগুলিকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে বার্ষিক জলবায়ু ঋণে ট্রিলিয়ন ডলার পাওনা দেওয়া ধনী ও উন্নত দেশগুলির কর্তব্য। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিকে আরও গভীর নির্গমণ হ্রাসের জন্য বাধ্য করতে এবং জলবায়ু অর্থায়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের বিষয়ে নিজেদের প্রতিশ্রুতিগুলিকে সম্মান দেওয়ার জন্য চাপ তৈরি করতে বাম ও প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে হাত মেলাতে হবে।

১.৩৮ উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্রমবর্ধমান ঋণের বোঝা, ক্রমবর্ধমান বৈষম্য এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের দায়িত্ব নিতে ও জলবায়ু ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করতে অস্বীকার করা ধনী, উন্নত পুঁজিবাদী দেশ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির জনগণের মধ্যে দ্বন্দ্বকে আরও তীব্র করে তুলেছে।

আমাদের প্রতিবেশী

১.৩৯ আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। অনেক দেশই তাদের নিজ নিজ সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণবিক্ষোভ প্রত্যক্ষ করেছে। এই বিক্ষোভের অনেকগুলিই ছাত্র-যুবদের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এদের সাথে সব অংশের মানুষই যুক্ত হয়। এই বিক্ষোভের বেশির ভাগেরই সাধারণ দাবি হল দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই, জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সংকট এবং স্বৈরাচার। প্রায়শই নিষ্ঠুর পুলিশ এবং সশস্ত্র বাহিনী ব্যবহার করে এই বিক্ষোভ দমনের চেষ্টা হলেও সফল হয়নি।

১.৪০ **বাংলাদেশে** ছাত্রদের নেতৃত্বে একটি দুর্বার গণ-আন্দোলনের ফলে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে থাকা শেখ হাসিনা ওয়াজেদ-এর স্বৈরাচারী শাসনের পতন ঘটে। এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বংশধরদের জন্য কোটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে। কিন্তু শীঘ্রই তা ছড়িয়ে পড়ে এবং সরকারের কর্তৃত্ববাদী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে এক বৃহত্তর চরিত্র ধারন করে। আন্দোলনকারীরা নিষ্ঠুর দমনপীড়নের সম্মুখীন হয়, পুলিশের গুলিতে শত শত মানুষ প্রাণ হারায়। সেনাবাহিনী সরকারের সমর্থনে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করায় শেখ হাসিনাকে ভারতে পালিয়ে যেতে হয়। অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে, ইসলামপন্থী মৌলবাদী শক্তিগুলি সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরি করতে সংখ্যালঘুদের লক্ষ্যবস্তু করে আক্রমণ শুরু করে। ধর্মনিরপেক্ষ বিরোধীরাও পরিকল্পিত আক্রমণের সম্মুখীন হয়। যে সমস্ত ধর্মীয় মৌলবাদী ও চরমপন্থীদের গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয়েছিল, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তাদের মুক্তি দেয়। এই ঘটনাগুলি সংবিধান এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলি

সম্পর্কে আশঙ্কা জাগাচ্ছে।

১.৪১ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার পশ্চিমী মিত্ররা চেষ্টা করছে হস্তক্ষেপ করার এবং তাদের স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। বাংলাদেশের কৌশলগত অবস্থানই এই দেশটার প্রতি তাদের আগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ কারণ। গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে সংখ্যালঘুদের অধিকার সুরক্ষিত করতে হবে। বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও সার্বভৌমত্বকে সব ধরনের বহিরাগত প্রভাব ও চাপ থেকে রক্ষা করাও তাদের দায়িত্ব। একমাত্র জনগণের প্রকৃত অভিযোগগুলি সমাধানের মাধ্যমেই তারা দেশকে বিভাজনের শক্তি এবং সাম্রাজ্যবাদীদের শিকার হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে। ভারতের সাথে দীর্ঘ স্থল-সীমান্ত থাকা একটি দেশ হিসাবে বাংলাদেশের এই সমস্ত ঘটনা আমাদের দেশেও প্রভাব ফেলতে বাধ্য।

১.৪২ **শ্রীলঙ্কার** রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং পরবর্তীতে সংসদ নির্বাচনে দুটি প্রধান শাসকশ্রেণির দলের প্রতিনিধিত্বকারী দুর্নীতিগ্রস্ত অভিজাতদের ওপর বিরক্ত মানুষ দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে পরিবর্তনের জন্য ভোট দেয়। জনতা বিমুক্তি পেরুমনার (JVP) নেতৃত্বে একটি কোয়ালিশন ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ার (NPP) বিজয়ী হয়। এক ঐতিহাসিক রায়ে, JVP নেতা অনুরা কুমারা দিসানায়েকে শ্রীলঙ্কায় রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন। সংসদীয় নির্বাচনে NPP বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছে, যেখানে নির্বাচিত সাংসদদের ৭০ শতাংশ এই প্রগতিশীল, বাম জোটের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের অঞ্চলে এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ইতিবাচক একটি ঘটনা।

১.৪৩ **মায়ানমারে** মিলিটারি জুন্টার শাসন জাতিগত ভিত্তিতে সংগঠিত সশস্ত্র মিলিশিয়াদের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। সেখানে কার্যত গৃহযুদ্ধ চলছে। মিলিটারি জুন্টা অনেক অংশে নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের পতন, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের নৃশংস দমন এবং ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে সামরিক প্রশাসনের ব্যর্থতাই, মিলিটারি ও সশস্ত্রগোষ্ঠীগুলির মধ্যে সংঘাতের কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে। এই সংঘর্ষের পিছনে সাম্রাজ্যবাদী এজেন্সিগুলির উপস্থিতি ও সমর্থনের প্রশ্নটি উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

১.৪৪ **পাকিস্তানে** পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (PTI) অযোগ্য ঘোষিত হবার পর, পাকিস্তান মুসলিম লীগ এন (PML-N) এবং পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির (PPP) জোট সরকার গঠিত হয়। সেনাবাহিনী একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং সরকারের কাজে হস্তক্ষেপ করছে। দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে সরকারের ব্যর্থতা আবারও জনগণকে সরকারের নীতি ও মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে রাস্তায় নামতে বাধ্য করেছে। বিভিন্ন অভিযোগে কারারুদ্ধ ইমরান খানের মুক্তির দাবিতে ব্যাপক বিক্ষোভ সংগঠিত হয়েছে।

১.৪৫ **আফগানিস্তান** থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাহারের ফলে তালিবান সরকার গঠিত হয়, যা ধীরে ধীরে বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি লাভ করছে। ভারত সরকার

ধীরে ধীরে তালিবানদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। তালিবানরা তাদের প্রতিক্রিয়াশীল ও পশ্চাদমুখী নীতিগুলি, বিশেষত মহিলাদের প্রতি, অব্যাহত রেখেছে।

১.৪৬ **মালদ্বীপ** ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক মুখ থুবড়ে পড়েছে মালদ্বীপের নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার পর। তিনি একটি ভারতবিরোধী মঞ্চ থেকে নির্বাচিত হন। মালদ্বীপে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বর্ধিত উপস্থিতির বিরুদ্ধে প্রচার করেন, যা সেই দেশের সার্বভৌমত্বের অপমান বলে বিবেচিত হয়েছিল। মালদ্বীপ সরকার এখন ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে।

১.৪৭ **নেপালের** CPN (UML) নেপালি কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের সরকারের নেতৃত্ব দিচ্ছে। পূর্বে ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি আবারও তিনটি ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিভাজন কিছু মানুষকে এই দলগুলি থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। রাজতন্ত্র অনুগামী শক্তিগুলি পুনরায় গ্রহণযোগ্যতা অর্জন ও মানুষের একটি বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হবার জন্য গণ-অসন্তোষকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। হিন্দুত্ববাদীরা, RSS সক্রিয়ভাবে এই শক্তিগুলিকে সমর্থন করছে এবং সদ্য গৃহীত ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান ও কমিউনিস্ট দলগুলির বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি

১.৪৮ **চীন :** ২৩তম কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে, শুধু 'অবরোধ' নয়, চীনকে 'বিচ্ছিন্ন' করার একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনকে 'কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বী' মনে করছে। এখানে আরও উল্লিখিত হয়, 'মার্কিন-চীন বিরোধ সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের মূল দ্বন্দ্বে প্রভাব বিস্তার করবে' (অনুচ্ছেদ ১-২৯)। এই সময়কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনকে অবরোধ ও বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা জোরদার করেছে, কিন্তু খুব বেশি সাফল্য পায়নি।

১.৪৯ চীনের হাইটেক এন্টার প্রাইজগুলি যাতে মূল প্রযুক্তি, মূল সরঞ্জাম ও উপকরণগুলি অ্যাক্সেস করতে না পারে তার জন্য বাধা তৈরির সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। চীনকে পৃথিবীতে সেমিকন্ডাক্টর সাপ্লাই চেন থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়া জাপান ও তাইওয়ানের সাথে একটি 'চিপ ফোর পার্টি অ্যালায়েন্স' তৈরি করেছে। বাইডেন প্রশাসন বাণিজ্য সম্পর্ককে আক্রমণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। শুল্ককে উন্নীত করেছে 'অতিউচ্চ' স্তরে এবং বাণিজ্য যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। মার্কিন নেতৃত্বাধীন 'G-7' এবং NATO প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে যে বিশ্বে তাদের প্রাধান্যের ক্ষেত্রে চীন একটি বড় হুমকি এবং চীনকে অবরুদ্ধ, বিচ্ছিন্ন ও প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার জন্য জোটকে শক্তিশালী করার অঙ্গীকার করেছে।

১.৫০ এই সমস্ত আক্রমণ সহ্য করেও চীন বিশ্ব অর্থনীতির বৃহত্তম গ্রোথ ইঞ্জিন। এর

জিডিপি ২০২৪ সালের প্রথম তিনটি ত্রৈমাসিকে বছরে ৪.৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অবশ্যই বার্ষিক ৫ শতাংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে। চীনের GDP ২০২৩ সালে ১২৬ ট্রিলিয়ন ইউয়ান ছাড়িয়ে যায়, যা ৫.২ শতাংশ বৃদ্ধি। বিশ্বে বিদেশি মুদ্রার টার্নওভারে চীনা মুদ্রার অংশ ২০ বছর আগে ১ শতাংশের কম থেকে বৃদ্ধি পেয়ে এখন ৭ শতাংশেরও বেশি হয়েছে, যা পৃথিবীর অন্যতম একটি বিশ্বাসযোগ্য অর্থনৈতিক পাওয়ার হাউস হিসাবে চীনের উত্থানের ইঙ্গিত বহন করছে। চীন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাষ্ট্রীয় মূলধন এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগগুলি যাতে আরো শক্তিশালী হয়, যাতে আরো ভালো করে ও আরো বড় হয়, মৌলিক কাজ ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করে, তা সুনিশ্চিত করতে চাইছে। চীন তার অর্থনীতিকে আরও পুনরুজ্জীবিত করতে ৯০০ বিলিয়ন ডলারের উদ্দীপনা ঘোষণা করেছে।

১.৫১ ১৫০টির বেশি দেশ এবং ৩০টিরও বেশি আন্তর্জাতিক সংস্থা চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI)-এ যোগ দিয়েছে। BRI-কে সমান ও পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মঞ্চ হিসাবে দেখা হয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চীনের দৃষ্টিভঙ্গিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। চীন এখন বিভিন্ন ঘটনায় ও দ্বন্দ্বের সমাধানে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হচ্ছে, যেমন - ইউক্রেন যুদ্ধের অবসানে একটি পরিকল্পনার প্রস্তাব রাখা, ইরান ও সৌদি আরবকে সম্পর্ক পুনরুদ্ধারে সাহায্য করা, ইজরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াই করা প্যালেস্তিনীয় সংগঠনের বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীকে একত্রিত করা।

১.৫২ **ভিয়েতনাম** : ভিয়েতনাম বিশ্বের দ্রুততম ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিগুলির মধ্যে একটি ২০২৪ সালে এর অনুমিত GDP ৬.৮-৭ শতাংশ। মাথাপিছু জিডিপি ২০২৪ সালে ৪৯০০ ডলারে পৌঁছেছে, যা তিন দশক আগে মাথাপিছু ২০০ ডলার ছিল। বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের হার প্রায় ১ শতাংশে নেমে এসেছে, যেখানে বেকারত্বের হার প্রায় ৪ শতাংশ। ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টি (CPV) দেশের অগ্রগতির লক্ষ্যে, অপচয় ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগগুলির পরিচালন দক্ষতা উন্নত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

১.৫৩ **কিউবা** : কঠোর অর্থনৈতিক অবরোধের উপর কোভিড মহামারীর কারণে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে কিউবার অর্থনীতি এখনো তা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। রেমিট্যান্স যা আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস, তা বন্ধ হয়ে যায় এবং জ্বালানি সরবরাহকারী দেশগুলির ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার কারণে জ্বালানির অভাব দেখা দেয়। কিউবা এই সমস্ত সংকট, বিশেষ করে খাদ্য, জ্বালানি ও বিদ্যুতের ঘাটতি কাটিয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। কিউবা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তীব্র আক্রমণকে প্রতিরোধ করছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বাস করে যে শাসন পরিবর্তন কার্যকর করার সময় এসেছে, তাই মিথ্যা ছড়িয়ে কিউবায় অস্থিরতা উসকে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

১.৫৪ **ডিপিআরকে (DPRK)** : চীনের সাথে বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায়, টানা তিন বছর সঙ্কুচিত হওয়ার পর ২০২৩ সালে উত্তর কোরিয়ার অর্থনীতি তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। জিডিপি বৃদ্ধি পেয়েছে ৩.১ শতাংশ, শিল্প উৎপাদন ৪.৯ শতাংশ (বিগত সাত বছরের মধ্যে দ্রুততম), নির্মাণ ক্ষেত্রে ৮.২ শতাংশ (২০০২ সালের পর থেকে বৃহত্তম) এবং কৃষি ক্ষেত্রে ১.০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিপিআরকে এবং রাশিয়া বাণিজ্য, অর্থনীতি এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রসারিত করতে সম্মত হয়েছে কারণ তাদের সম্পর্ককে দৃঢ় করে তারা পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

১.৫৪ **লাওস** : পর্যটন, পরিবহণ, লজিস্টিকস ও শক্তি ক্ষেত্রে উৎসাহব্যঞ্জক বৃদ্ধির ফলে, ২০২৪ সালে লাওসের জিডিপি নিজস্ব লক্ষ্যমাত্রাকে অতিক্রম করে, ৪.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। মুদ্রাস্ফীতি, বিনিময় হারের ওঠানামা, পণ্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, বৈদেশিক ঋণের বোঝা এবং ভয়াবহ বন্যাসহ গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জগুলি বিগত বছরে মোকাবিলা করে সরকার অর্থনৈতিক বৃদ্ধি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। লাও পিপলস রিভলিউশনারি পার্টি সরকারি ঋণ, মুদ্রাস্ফীতি, বিনিময় হার এবং ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রা ব্যয় মোকাবিলার প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

১.৫৬ এই পুরো সময়জুড়ে সাম্রাজ্যবাদ চীন, কিউবা এবং উত্তর কোরিয়ার ওপর তার আক্রমণ বাড়িয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ স্পষ্টভাবে শাসন পরিবর্তন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য ঘোষণা করেছে। কমিউনিস্ট পার্টি, সমাজতন্ত্র এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ স্পষ্টভাবে সাম্রাজ্যবাদের জন্য বিপদ হিসাবে চিহ্নিত। কমিউনিস্ট মতাদর্শকে খাটো করতে এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে অস্থিতিশীল করে তুলতে সমস্ত প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, যা সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্বকে তীব্র করছে।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সহযোগিতা এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংহতি

১.৫৭ (১) তীব্র সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, পুঁজিবাদী শোষণ এবং অতি দক্ষিণপন্থী শক্তির বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে, কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির মধ্যে সংহতি ও সহযোগিতা আরও বেশি তাৎপর্য বহন করে। সমন্বিত পদক্ষেপ, সংহতি আন্দোলন এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সকল শক্তিকে একত্রিত করা একটি অগ্রাধিকার।

(২) সিপিআই(এম) সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া উদারবাদের বিরুদ্ধে এবং পরিবেশের সুরক্ষা ও জলবায়ু ন্যায় বিচারের জন্য লড়াই করছে এমন সকল শক্তির সাথে হাত মেলাবে।

(৩) সিপিআই(এম) প্যালেস্তাইনের জনগণের সাথে তার সংহতি পুনর্ব্যক্ত করে এবং ১৯৬৭ সালের পূর্বের সীমানা অনুযায়ী ও পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী

করে প্যালেস্তাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে দাঁড়ায়।

(৪) সিপিআই(এম) সমাজতান্ত্রিক দেশ চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা, ডিপিআরকে এবং লাওসকে সংহতি জানাচ্ছে, সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের প্রচেষ্টা এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছে।

(৫) সিপিআই(এম) ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া, নিকারাগুয়া, কলম্বিয়া, উরুগুয়ে, ব্রাজিল ও অন্যান্য লাতিন আমেরিকার দেশগুলির জনগণের পাশে আছে যারা তাদের বশংবদ করা ও তাদের সার্বভৌমত্বকে আগ্রাহ্য করার সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করছে।

(৬) সিপিআই(এম) নয়া ফ্যাসিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, ধর্মীয় উন্মাদনা, জাতিবাদ, পিতৃতন্ত্র, এথনিক শভিনিজম এবং সব ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন এমন সব মানুষের পাশে আছে।

জাতীয় পরিস্থিতি

জাতীয় পরিস্থিতির প্রধান বিষয়সমূহ

২.১ ২৩তম পার্টি কংগ্রেসের তিন বছর পরে জাতীয় পরিস্থিতির প্রধান বিষয়গুলি উল্লেখ করা হল:

১) এই পর্বে বিজেপি সরকার রাষ্ট্রীয় মদতে হিন্দুত্বের কর্মসূচি রূপায়ণে আগ্রাসী মনোভাব নিয়েছে। ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধন, উত্তরাখণ্ডে বিজেপি সরকারের দ্বারা ইউনিফর্ম সিভিল কোড প্রণয়ন, একাধিক বিজেপি শাসিত রাজ্যে মুসলমান সংখ্যালঘুদের নিশানা করে বহুবিধ আইন প্রণয়ন যেমন অন্য ধর্মে বিবাহ রোধে আইন এবং সংসদে পেশ হওয়া ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন। বিভিন্ন ধর্মীয় শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের উপরে একের পর এক হামলার ঘটনা এবং বিভিন্ন মসজিদের জমির মালিকানা ছিনিয়ে নেওয়ার দাবি তুলে সংখ্যালঘুদের উপরে একের পর এক আক্রমণের ঘটনা ঘটেই চলেছে। দেশজোড়া হিন্দু সংহতি গড়ে তোলার নাম করে জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে চিরস্থায়ী করে তোলাই এসমস্ত ঘটনার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

২) দেশের সমস্ত সম্পদ ও সম্পত্তিকে বৃহৎ পুঁজিবাদীদের হাতে তুলে দেওয়াই বিজেপি সরকারের অর্থনৈতিক নীতির প্রাথমিক বোঝাপড়া। বিরাট আকারের ব্যবসায়িক সংস্থাগুলির মধ্যে সরকারের পছন্দসই একটি গোষ্ঠীই পরিকাঠামো নির্মাণ ও জ্বালানি সংক্রান্ত যাবতীয় বরাতের অধিকারী হয়ে অতি মুনাফার (সুপার প্রফিট) জোরে ফুলেফেঁপে উঠেছে। এমন নীতির ফলে আর্থিক বৃদ্ধি ঢিমেতালে চলছে, বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি ও বৈষম্য বেড়ে চলেছে।

৩) গত তিন বছরে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার দুয়ের উপরেই আক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিরোধী দলসমূহের নেতা নেত্রীদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলিকে কাজে লাগিয়ে মামলা দায়ের করা, তাদের গ্রেপ্তার করার মতো ঘটনা আগের চাইতে অনেক বেশি নির্লজ্জ কায়দায় চলেছে। দানবীয় ইউএপিএ আইন ও অর্থ তছরুপ রোধ আইনকে ব্যবহার করে এমন করা হচ্ছে। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ গণমাধ্যমকেও নিশানা করা হয়েছে। সংসদীয় কার্যধারাকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা আরও বেড়েছে।

৪) রাজ্যের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করে কেন্দ্রের হাতে বাড়তি ও একচ্ছত্র

ক্ষমতা তুলে দেওয়ার চেষ্টা আগের চাইতে আরও তীব্র হয়েছে। যে সমস্ত রাজ্যে বিরোধী রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় রয়েছে, সেখানেই রাজ্যের প্রাপ্য আটকে রাখা, সেখানকার রাজ্যপালের সাহায্যে সরকারের কাজে বাধা দেওয়ার মতো ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে।

৫) বিদেশনীতির নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি নির্ভরতা ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়েছে। যদিও বহুমুখী বিশ্ব পরিস্থিতি ভারত সরকারকে ব্রিকস এবং সাংহাই কর্পোরেশন অর্গানাইজেশন জোটে সক্রিয় সদস্য হিসাবে থাকতে বাধ্য করছে।

৬) এই সময়কালে নয়া শ্রম আইন বাতিল, ন্যূনতম মজুরি, ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালনার অধিকার সহ বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে শ্রমিকশ্রেণির একাধিক লড়াই আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের আইনানুগ ব্যবস্থা সহ অন্যান্য দাবিতে কৃষকদের আন্দোলন চলছে। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার উদ্যোগে যৌথ কর্মসূচি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৭) ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল বিজেপি'র জন্য এক ধাক্কা। এই নির্বাচনে বিজেপি সংসদে নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে, তারা জোট সরকার গঠন করতে বাধ্য হয়েছে। অবশ্য এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে বিজেপি ক্রমাগত কর্তৃত্ববাদী কর্মসূচি ও কর্পোরেট হিন্দুত্ব আঁতাতের রাজনীতিকে ব্যবহার করছে।

অর্থনৈতিক অধোগতি

২.২ সরকারিভাবে প্রকাশিত জিডিপি বৃদ্ধির পরিসংখ্যানটি সন্দেহজনক, কারণ এই পরিসংখ্যানের গণনা মুদ্রাস্ফীতির যে হারের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে তা অপ্রত্যক্ষ (ইমপ্লিসিট)। এই হার ক্রেতা মূল্য সূচক (কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স) হতে নির্ধারিত মূল্যের এক চতুর্থাংশও নয়। এমন কারসাজি করে নির্ধারিত পরিসংখ্যান সত্ত্বেও অর্থনৈতিক মন্দাকে লুকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। ২০২৪-২৫ সালের জন্য জিডিপি'র হিসাব অনুমান (অগ্রিম হিসাব) করতে গিয়ে বৃদ্ধিকে ৬.৪ শতাংশ দেখানো হয়েছে, আগের বছর এই বৃষ্টির হার ছিল ৮.২ শতাংশ। এর থেকেই বোঝা যায়, শ্রমজীবী মানুষের উপর বাড়তি বোঝা চাপিয়ে দিয়ে পুঁজিবাদী নীতির জোরে কোভিড সঙ্কট থেকে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের এহেন প্রচেষ্টা কার্যত এক অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এবং ভ্রান্ত প্রয়াস।

২.৩ বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটের প্রকৃত কারণ অর্থনীতিতে চাহিদার অভাব তৈরি হওয়া, অর্থাৎ, জনসাধারণের পর্যাপ্ত ক্রয়ক্ষমতা নেই। এর কারণ দেশের জনগণের এক বিশাল অংশকে সামান্য আয় বা মজুরির উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করতে হচ্ছে। ২০২৩-২৪ সালের পরিবার পিছু পণ্য ও পরিষেবা খাতে ব্যয় সংক্রান্ত সম্প্রতি প্রকাশিত তথ্য বলছে ভারতের গ্রামাঞ্চলে চারজন সদস্যের একটি পরিবারে গড় মাসিক ব্যয় মাত্র ৮,০৭৯ টাকা, শহরাঞ্চলে ১৪,৫২৮ টাকা। বেকারি,

মুদ্রাস্ফীতি বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে তার প্রভাব মানুষের প্রকৃত আয়কে আরও হ্রাস করছে। বাজারে চাহিদা কম থাকার কারণে যতটা উৎপাদন করা সম্ভব তার চাইতে উৎপাদনের পরিমাণ কম রাখা হচ্ছে। নতুন করে বিনিয়োগ করেও উৎপাদন বাড়ানোর কোনও সুযোগ থাকছে না। কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমাগত আমদানি কর কমিয়ে চলায় বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি বেড়েছে। এর প্রভাবে দেশিয় পণ্য উৎপাদন ধ্বংস হয়ে যাবে, স্থায়ী বাণিজ্য ঘাটতি দেখা দেবে। অর্থনীতি যত দুর্বল হবে, ভারতীয় মুদ্রার মূল্যও ততই কমবে, এতে আমদানি বাবদ খরচ আরও বৃদ্ধি পাবে। এমন ক্রমবর্ধমান সঙ্কটের বিষয়ে মোদী সরকার কার্যত দিশাহীন, অথচ কর্পোরেটদের সুবিধা পাইয়ে দিতে তারা নির্লজ্জের মতো বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে চলেছে। ভারতের অর্থনীতিতে ইতিমধ্যেই অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে, অপর্যাপ্ত আয়, মূল্যবৃদ্ধি এবং ব্যাপক বেকারির পরিস্থিতির মুখোমুখি দেশের জনসাধারণ নিজেদের সরকারের তরফে কোনোরকম সহায়তা পাচ্ছে না।

২.৪ কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে প্রত্যক্ষ আয়কর বাবদ সরকারের যত রাজস্ব আদায় হচ্ছে অপ্রত্যক্ষ কর বাবদ রাজস্বের পরিমাণ তার চাইতে বেশি। প্রত্যক্ষ আয়কর বাবদ ২০১৪-১৫ সালে আদায় হতো মোট রাজস্বের ২০.৮ শতাংশ। ২০২৪-২৫ সালে তার পরিমাণ বেড়ে ৩০.৯ শতাংশ হয়েছে। ২০১৭-১৮ সালে, কর্পোরেট কর বাবদ মোট আদায় রাজস্বের প্রায় ৩২ শতাংশ ছিল, কিন্তু ২০২৪-২৫ বাজেটে তা কমে ২৬.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। কর্পোরেট কর ছাড় দেওয়া ও কমিয়ে দেওয়ার কারণে সরকার প্রতি বছর প্রায় ১.৪৫ লক্ষ কোটি টাকা হারাচ্ছে। এতেই বোঝা যায় কর্পোরেটদের প্রতি সরকারের স্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। জনকল্যাণের ব্যয় কমিয়েও তারা সেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। কর্পোরেট কর কমানোর মতো বহুবিধ সরকারি সহায়তা সত্ত্বেও, বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগে প্রস্তুত নয় কারণ উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা নেই। চাহিদার অভাবের কারণ শ্রমজীবীদের প্রকৃত মজুরি বাড়েনি, একজায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

২.৫ কেন্দ্রীয় সরকার জনকল্যাণ খাতে জিডিপি'র ৭ শতাংশেরও কম ব্যয় করছে। ওইসিডি'র অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি এই বাবদ নিজেদের জিডিপি'র ২১ শতাংশ অবধি ব্যয় বরাদ্দ করে। মোট বাজেট ব্যয়ের অংশ হিসেবে, ২০২৪-২৫ সালের সামাজিক ব্যয় বাবদ খরচ ২০২০-২১ সালের তুলনায় ৪০ শতাংশ কম এবং জিডিপি'র শতাংশের নিরিখে ঠিক অর্ধেক হয়ে গেছে। ফলস্বরূপ, এমজিএনরেগা, খাদ্য ভর্তুকি, সমাজকল্যাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সারে ভর্তুকি – যাবতীয় খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণে কাটছাঁট হয়েছে। সরকারি সহায়তার এহেন অভাব জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি করেছে, ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস করেছে এবং দারিদ্র্যের অবস্থাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

সম্পদের হস্তান্তর ও কর্পোরেট লুট

২.৬ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জনসাধারণের সম্পত্তিসমূহকে বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাতে হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে মোদী সরকার সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা পুনর্গঠনের

জন্য একগুচ্ছ নীতিমালা তৈরি করেছে। জাতীয় সড়ক নির্মাণ, রেলপথ, বিমানবন্দর, পাইপলাইন, ট্রান্সমিশন লাইন ইত্যাদি সহ যাবতীয় উন্নত ভূ-সম্পত্তিতে দীর্ঘমেয়াদী লিজের নামে বেসরকারি পুঁজিপতি এবং আর্থিক সংস্থাগুলিকে একচেটিয়া অধিকার পাইয়ে দেওয়ার জন্য ২০২১-২২ বাজেটে ন্যাশনাল ম্যানিটাইজেশন পাইপলাইন (NMP) চালু করা হয়। এর অধীনে নির্মিত পরিকাঠামোয় ব্যাপক সরকারি বিনিয়োগ করা হচ্ছে এবং পাঁচটি বৃহত্তম কর্পোরেট এইসব প্রকল্পগুলি থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করছে। এই সরকারের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে দেশি বিদেশি বেসরকারি সংস্থার মালিকানায় হস্তান্তরের জন্য দখলদারির কৌশল। লৌহ আকরিক, কয়লা এবং বক্সাইটের মতো প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের জন্য বেসরকারি সংস্থার হাতে খনিজ ব্লক নিলাম করার উদ্দেশ্যেই জাতীয় খনিজ নীতি ২০১৯ গৃহীত হয়। সম্প্রতি মাইনস অ্যান্ড মিনারেলস (ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেশন) আইনে সংশোধনী আনা হয়েছে। এর সুবাদে লিথিয়াম ও কোবাল্টের মতো দুষ্প্রাপ্য আকরিকের উপরেও বেসরকারি মালিকানা কায়েম হবে। এসবের শেষে পুঁজি বিনিয়োগে বিশেষ সুবিধা (ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট ইনসেনটিভ) দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। পরিবর্তিত আইনের নামে এসবই আসলে এমন এক প্রকল্প যেগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইনসেনটিভ দেওয়ার মাধ্যমে সরাসরি সরকারি তহবিল থেকে কর্পোরেটদের অর্থ যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এসমস্ত নীতির সবচেয়ে বেশি সুবিধাভোগী হবে নির্দিষ্ট কিছু বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। আম্বানি, আদানি, টাটা, আদিত্য বিড়লা এবং ভারতী টেলিকম অর্থাৎ দেশের পাঁচটি বৃহৎ কর্পোরেট সংস্থার হাতে নন ফাইনান্সিয়াল ক্ষেত্রের ২০ শতাংশেরও বেশি সম্পদের মালিকানা রয়েছে। বেসরকারি মালিকানার হাতে থাকা সম্পদের ঘনত্ব এবং একচেটিয়াকরণের মাত্রা এর থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

বৈষম্যের তীব্রতা বৃদ্ধি

২.৭ পৃথিবীতে সবচেয়ে অসাম্য বিরাজ করছে এমন দেশগুলির মধ্যে ভারত একটি অন্যতম দেশ হয়ে উঠেছে। ২০২২-২৩ সালের বিশ্বজোড়া বৈষম্যের প্রতিবেদন (গ্লোবাল ইনইকুয়ালিটি রিপোর্ট) অনুসারে ভারতে জনসংখ্যার শীর্ষ ১ শতাংশ মোট আয়ের ২২.৬ শতাংশ দখল করে রয়েছে এবং এরাই দেশের ৪০.১ শতাংশ সম্পদের মালিক। এমন পরিসংখ্যান ভারতের ইতিহাসে এখনও অবধি সর্বোচ্চ। ব্রিটিশ শাসনের সময়ের চাইতেও আজকের বৈষম্য বেশি। ভারতের শীর্ষ ১ শতাংশের আয় দুনিয়ায় সর্বোচ্চ, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ ১ শতাংশের চাইতেও বেশি। অন্যদিকে, ভারতে আয়ের নিরিখে সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছেন জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ মানুষ যাদের হাতে মোট সম্পদের পরিমান দেশের সম্পদের মাত্র ৩ শতাংশ।

২.৮ ফোর্বস পত্রিকা বিলিয়নেয়ারদের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। ঐ তালিকা মোদী

সরকারের আমলে সম্পদের চূড়ান্ত কেন্দ্রীকরণকে স্পষ্ট করে দেয়। ২০১৪, যে বছর মোদী প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, ভারতে বিলিয়নেয়ার ছিলেন ১০০ জন। ২০২৪ সালে সেই সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে, এখন আমাদের দেশে ২০০ জন বিলিয়নেয়ার। এই ২০০ জনের মধ্যেও সর্বোচ্চ ১০০ ধনী ব্যক্তির সম্মিলিত সম্পদের পরিমাণ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি, এমনটা আগে কখনো হয়নি। এটাই মোদী সরকারের দশ বছরের শাসনের বৈশিষ্ট্য।

কৃষিক্ষেত্রে দুর্দশা

২.৯ মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি-এনডিএ সরকার অনুসৃত নয়া-উদারনৈতিক ও কর্পোরেটপন্থী আর্থিক নীতির ফলে দেশের কৃষিক্ষেত্র সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর (এনসিআরবি) তথ্য বলছে ২০১৪ (মোদী শাসনের প্রথম বছর) থেকে ২০২২ (এর পরে আর তথ্য মেলে না) পর্যন্ত, ভারতে ১,০০,৪৭৪ জন কৃষক এবং খেতমজুর আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন, মূলত ঋণের কারণে। ২০২৪ সালে প্রকাশিত বিশ্ব ক্ষুধা সূচক (গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স) অনুযায়ী ১২৭টি দেশের মধ্যে ভারত ১০৫তম স্থানে রয়েছে। দেশের কৃষিক্ষেত্রে সঙ্কটের মূল কারণসমূহ যা এই সময়কালে আরও তীব্র হয়েছে সেগুলি হল:

(ক) সরকারি ভর্তুকি হ্রাস এবং কৃষি উপকরণ উৎপাদনে কর্পোরেটদের সহায়তা যোগানোর কারণে চাষের খরচ বৃদ্ধি;

(খ) উৎপাদন খরচের দেড় গুণ (C2+50 শতাংশ) লাভজনক ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় সরকার অস্বীকৃত হওয়ায় ফসলের দামে কোনও সামঞ্জস্যপূর্ণ বৃদ্ধি হয়নি, এমনকি প্রায়শই হ্রাস হতেও দেখা গেছে;

(গ) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিপূরণের জন্য পর্যাপ্ত বীমা ব্যবস্থার অভাব; প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা (PMFBY) বস্তুত কৃষকদের জন্য একটি প্রহসন। ঐ প্রকল্প কার্যত বীমা কোম্পানিগুলির জন্যই অর্থকরী প্রকল্প হিসাবে প্রমাণিত হচ্ছে। এর সুবাদে বীমা সংস্থাগুলি গড়ে ২৫ শতাংশ মুনাফা করছে;

(ঘ) ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ দেওয়ার নীতি এমনই একপেশে যাতে কর্পোরেটদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে অথচ কৃষকদের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। এমন নীতির সুবাদে তারা অর্থলোলুপ মহাজনদের কাছে যেতে বাধ্য হচ্ছে এবং ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ছে।

২.১০ কৃষি সঙ্কট ক্রমশ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কৃষকদের গুরুতর দুর্দশার আরেকটি মূল কারণ কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাতে সরকারি বিনিয়োগ ক্রমাগত হ্রাস পাওয়া। কেন্দ্রীয় বাজেটে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাতে মোট বরাদ্দ ২০১৯ সালে ছিল ৫.৪৪ শতাংশ। ২০২৪ সালে সেই বরাদ্দ আরও কমে ৩.১৫ শতাংশ হয়েছে। সার ও খাদ্য ভর্তুকি কমানো হয়েছে। এমএনরেগায় বরাদ্দের পরিমাণ ৮৬,০০০ কোটি টাকা, যা

আগের বছরের বরাদ্দের চাইতে কম। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি, প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা এবং অন্যান্য যাবতীয় প্রকল্পের জন্য বরাদ্দে ছাঁটাই হয়েছে। বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে সহায়তার যোগান দিতে গিয়ে কৃষিক্ষেত্রে গবেষণা, উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ পরিষেবা সংক্রান্ত যাবতীয় তহবিল অকেজো হয়ে পড়েছে।

২.১১ কৃষিক্ষেত্রের কর্পোরেটকরণ করাই কেন্দ্রীয় সরকারের মূল লক্ষ্য যাতে লুটেরা কৃষি বাণিজ্য সংস্থাগুলিকে লাভবান করা যায়। বিদ্যুৎ আইন (সংশোধন) বিল, স্মার্ট মিটার স্থাপন অভিযান, আদানি পাওয়ার, রিলায়েন্স পাওয়ার, টাটা পাওয়ার ইত্যাদির ক্রমবর্ধমান প্রভাব, গ্রাম ও শহর দু'দিকেই গ্রাহকদের জন্য বিদ্যুতের বিশাল শুল্ক বৃদ্ধিতে স্পষ্ট, বিদ্যুৎ বেসরকারিকরণ করা হচ্ছে। সেচ খাতের বিষয়েও একই কথা প্রযোজ্য। ডিজিটালাইজেশনের নামে, সরকার গ্রামের দরিদ্র মানুষের অধিকারের উপর সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু করেছে, যা MNREGA কর্মীদের দুর্দশার মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হচ্ছে। গত দু'বছরে, গ্রামীণ রোজগার আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন করে ৮ কোটি MNREGA কর্মীর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়েছে, তাদের ন্যায্য কাজের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন কৃষক পরিবার এবং কৃষি জমির মালিকানায় বৈষম্য তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৯-২১ সালে পরিচালিত ৫ম জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা (NFHS) অনুসারে, ৪৭.৮ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারের কোনও কৃষি জমি ছিল না; গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বসবাসকারী শীর্ষ ২০ শতাংশ ধনী পরিবারের হাতেই মোট কৃষি জমির ৮২ শতাংশ মালিকানা ছিল।

২.১২ কৃষিকাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে গ্রামীণ শ্রমজীবীদের বিপরীতমুখী প্রবাহের ফলে গ্রামীণ দরিদ্রদের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। প্রকৃত গ্রামীণ মজুরি যেখানে ০.৪ শতাংশ কমেছে সেই সময় কৃষিতে মজুরি বৃদ্ধির প্রকৃত হার মাত্র ০.২ শতাংশ। প্রকৃত গ্রামীণ মজুরির হ্রাস গ্রামাঞ্চলে ধনী চক্রের দ্বারা গ্রামীণ শ্রমিকদের শোষণের তীব্রতার ইঙ্গিতবাহী। দরিদ্র ভাড়াটে কৃষকদের উপরেই এ সঙ্কট সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। গ্রামাঞ্চলে দুর্দশা বাড়ার কারণেই খেতমজুরদের আত্মহত্যা বেড়েছে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর তথ্য বলছে, ২০২২ সালে ৬,০৮৭ জন খেতমজুর আত্মহত্যা করেছেন। ২০২১ সালে সেই সংখ্যা ছিল ৫,৫৬৩।

শ্রমিক শ্রেণির উপরে শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি

২.১৩ এই পর্বে শ্রমিক শ্রেণির কষ্টার্জিত অধিকারের উপর সর্বাত্মক আক্রমণ নেমে এসেছে। ঐক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়নের লড়াইয়ের জোরে কুখ্যাত চার শ্রম আইন বাস্তবায়ন স্থগিত করা হলেও কেন্দ্রের মোদী সরকার ও অন্যান্য রাজ্য সরকার অনুসৃত নীতির মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগের পদ্ধতিতে শোষণমূলক পরিবর্তনগুলির অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করেছে। নয়া-উদারনীতিতে এক অপরিহার্য উপাদান হিসাবে ঠিকাদারীকরণের প্রক্রিয়া তীব্রতর হয়েছে, নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ

কর্মীর শতাংশ ২০১৮ সালে ছিল ৩৬.৩৮ শতাংশ, ২০২৩ সালে সেই অংশগ্রহণ বেড়ে হয়েছে ৪০.৭২ শতাংশ। ২০১৪-১৫ থেকে ২০২০-২১ সালের মধ্যে সংগঠিত ক্ষেত্রে মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ৬ শতাংশ, আগের ছয় বছরে এই বৃদ্ধির হার ১০.১ শতাংশ ছিল। এই পরিসংখ্যানের মাধ্যমেই শ্রমিক শোষণের চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে যায়। মুদ্রাস্ফীতির উচ্চহারের কারণে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি হ্রাস পেয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে শোষণের আরেকটি দিক হল মোট উৎপাদন মূল্যে মজুরির অংশ (নেট ভ্যালু অ্যাডেড)। ২০২০ সালে মজুরির হার ছিল ১৮.৯ শতাংশ, ২০২৩ সালে আগের চাইতে তিন শতাংশ পয়েন্ট কমে সেই পরিমাণ ১৫.৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে মোট মূল্যে 'লাভের অংশ' ৩৮.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ৫১.৯ শতাংশে পৌঁছে গেছে।

২.১৪ দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলেই ন্যূনতম মজুরি দেওয়া হচ্ছে না। কিছু রাজ্যে কাজের ঘণ্টার সংখ্যা যথেচ্ছভাবে ১২ ঘণ্টা বা তারও বেশি বৃদ্ধি করা হচ্ছে, ওভারটাইম দেওয়া হচ্ছে না। ব্যবসার সুযোগসুবিধা নিশ্চিত করার নামে সরকার বড় কোম্পানির পক্ষ নিচ্ছে, ইউনিয়ন করার অধিকারও আক্রমণের মুখে। দর কষাকষির ক্ষমতা হ্রাস এবং বেকারত্বের অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পাশাপাশি ঠিকাদার কর্মীরা যদি সংগঠিত হওয়ার সাহস দেখালে চাকরি হারানোর ঝুঁকি রয়েছে।

২.১৫ খুচরো ব্যবসা ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে, এর ফলে গিগ অর্থনীতি নির্ভর পরিষেবার মাধ্যমে ৭৭ লক্ষ কর্মী চুক্তিবদ্ধ অথবা অস্থায়ী কর্মী হিসেবে এবং অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট, সুইগি, জোমাটো, উবার এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। ক্রমবর্ধমান এই কর্মীবাহিনীর জন্য কোনও বাধ্যতামূলক এবং পৃথক শ্রম আইন নেই যার ফলে তারা সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতিতে পড়েছে।

২.১৬ শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী পরিকাঠামো গড়ে তুলে সরকারি কর্মচারী যেমন স্কিম ওয়ার্কাররা যাদের বেশিরভাগই মহিলা, তাদের কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। মহিলাদের মধ্যে কাজে যুক্ত হয়ে উপার্জনের তীব্র চাহিদা রয়েছে, এই সুযোগে অঙ্গনওয়াড়ি, মিড-ডে মিল কর্মী, আশা ইত্যাদি পরিষেবায় নিযুক্ত লক্ষ লক্ষ কর্মীদের ন্যূনতম মজুরি, পেনশন ইত্যাদির মতো ন্যূনতম অধিকার দিতে কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে অস্বীকার করছে তা অত্যন্ত লজ্জাজনক। সবচেয়ে শ্রমিক-বিরোধী সরকার হিসাবে মোদী সরকার নিজেদের প্রমাণ করেছে।

২.১৭ কোভিড মহামারীর পর্বে ভারতে অভিবাসী শ্রমিকদের ভয়াবহ দুর্দশা 'উল্লেখযোগ্যভাবে' প্রকাশ পায়। প্রায় ১২ কোটি শ্রমিক মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে অনুমান করা হয়। তবে, ভারতে অভিবাসী শ্রমিকের সংখ্যা সম্পর্কে কোনও 'নির্ভরযোগ্য তথ্য' নেই, সরকারের তরফে কিছু আনুমানিক হিসাব পেশ করে দাবি করা হয় যে তাদের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, কৃষিক্ষেত্রে সঙ্কটের মাত্রা, কৃষিকাজের অভাবের কারণে, গ্রামীণ ভারতে বিকল্প কর্মসংস্থান না থাকায়, স্বল্পমেয়াদী চক্রাকার অভিবাসন বা দীর্ঘমেয়াদী অভিবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি

পাওয়ার সম্ভাবনা রয়ে যায়। কোভিডের অভিজ্ঞতার পরে অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও, ঠিকাদারদের উপর নির্ভরশীল অভিবাসী শ্রমিকদের দুর্দশার পরিস্থিতির কোনও সুরাহা হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে সরকারি সহায়তা খুব কম বা একেবারেই নেই। মহিলা অভিবাসী শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত।

জনসাধারণের অবস্থা

২.১৮ মূল্যবৃদ্ধির বোঝা – ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি বিশেষ করে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়ে যাওয়ার প্রভাবে সাধারণ পরিবারগুলির মাসকাবারি পরিকল্পনা ভেঙে পড়েছে। এমনিতেই আমাদের দেশে কম উপার্জনের কারণে সাধারণ শ্রমজীবী পরিবারে মাসিক আয়-ব্যয়ের চিত্রে রদবদলের সুযোগ খুবই সামান্য। গত তিন বছরের ক্রেতা মূল্যসূচক (কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স) অনুসারে সাধারণ মূল্যবৃদ্ধির হার প্রায় ২০ শতাংশ বলে অনুমান করা হলেও, খাদ্যদ্রব্যের দাম ২৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেহেতু বেশিরভাগ মানুষ তাদের আয়ের প্রায় অর্ধেকই খাদ্য কিনতে ব্যয় করে, তাই এমন বৃদ্ধির অভিঘাতে জীবনযাত্রার ব্যয় নির্মমভাবে বেড়েছে। মোদী সরকারের সিদ্ধান্তের কারণে খাদ্য ছাড়াও অন্যান্য বেশ কিছু প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, দাম নিয়ন্ত্রণকারী সরকারি সংস্থার তরফেই বেশ কিছু ওষুধের দাম বৃদ্ধিতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সরকার-চালিত মূল্যবৃদ্ধির সবচেয়ে ভয়াবহ উদাহরণ হলো পেট্রোলিয়াম পণ্য। মোদী সরকার কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া উচ্চ-আবগারি শুল্কের কারণে পেট্রোল এবং ডিজেলের খুচরো মূল্য অনেকটাই বেড়েছে, অথচ আন্তর্জাতিক বাজারে সম্প্রতি অপরিশোধিত তেলের দাম ১৮ শতাংশ কমেছে। জ্বালানির দাম বৃদ্ধির ফলে পরিবহণ খরচ বৃদ্ধি পায়, খাদ্যদ্রব্যে উচ্চমূল্য চুকিয়ে জনগণকে সেই ভার বহন করতে হয়। রান্নার গ্যাসে ভর্তুকি বন্ধ করে দেওয়া হলে তার দাম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। সংক্ষেপে, সরকার মূল্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে চাপের মুখে ফেলেছে যাতে সরকারি তহবিলের সম্পদকে বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং পাইকারি ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে হস্তান্তর করা যায়।

২.১৯ বেকারি – গত কয়েক বছরে দেশে কাজের সঙ্কট নানাভাবে তীব্রতর হয়েছে, মহামারীর পর বহুল প্রচারিত পরিস্থিতির পুনরুদ্ধার বাস্তবায়িত হয়নি। বেকারত্ব সংক্রান্ত সরকারি তথ্যে (পিরিয়ডিক লেবর ফোর্স সার্ভে) প্রত্যাশিতভাবেই ২০২৩-২৪ সালের সামগ্রিক বেকারত্বের হারকে মাত্র ৩ শতাংশ বলে অনুমান করা হয়েছে। অন্যান্য সংস্থা যেমন সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমি-র তথ্য বলছে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বেকারির হার প্রায় ৮ শতাংশে পৌঁছেছিল যা তার আগের কয়েক মাস ধরে ৬-৯ শতাংশের মধ্যে ছিল। এমনকি সরকারও নথিভুক্ত করতে বাধ্য হয়েছে যে সারা দেশে ১৫-২৯ বছর বয়সী তরুণদের মধ্যে সামগ্রিক বেকারত্বের হার ১০ শতাংশেরও বেশি, শহরাঞ্চলে সেই হার প্রায় ১৫

শতাংশ। মনে রাখতে হবে এসমস্ত পরিসংখ্যান ভয়াবহ বাস্তব পরিস্থিতির প্রকৃত চিত্রটি তুলে ধরে না কারণ বেশিরভাগ কর্মক্ষম মানুষ বেঁচে থাকার জন্য যেকোনও কাজে 'নিযুক্ত' হতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মজুরিতেই রাজি হয়ে যায়। একে আড়ালে থাকা বা ছদ্মবেশী বেকারত্ব ছাড়া আর কিছুই বলা উচিত নয়। সাম্প্রতিক সময়ের আরেকটি ভয়াবহ প্রবণতা হল কৃষিতে কর্মরত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি যা মহামারীর পরে আরও বেড়েছে। অন্যদিকে উৎপাদন ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যায় হ্রাস দেখা গেছে। স্থিতিশীল, ভালো বেতন এবং নিরাপদ কর্মসংস্থানের পরিবর্তে, সরকারি নীতি বিপরীতমুখী সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা ইতিমধ্যেই মানুষকে কম আয় ও মৌসুমী জলবায়ুর সম্পৃক্ত কৃষিক্ষেত্রের কাজে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে।

হিন্দুত্বের কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে চলা

২.২০ গত তিন বছরের ঘটনাবলীই যথেষ্ট প্রমাণ দেয় যে হিন্দুত্বকে রাষ্ট্রীয় আদর্শে পরিণত করতে এবং ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রকে হিন্দু রাষ্ট্রে রূপান্তর করার উদ্দেশ্যে আরএসএস'র কর্মসূচি পদ্ধতিগতভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মুসলমান জনসাধারণকে 'অপর' হিসাবে নিশানা করে এক দেশজোড়া হিন্দু পরিচয় নির্মাণ। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন একটি রাষ্ট্র পোষিত অনুষ্ঠানে পরিণত হয়, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নিজেই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে বারাণসীর জ্ঞানবাপি মসজিদ এবং মথুরার ঈদগাহকে লক্ষ্য করে ঐ দুটি স্থানের উপর আইনি বিরোধ প্রতিষ্ঠা করা, দাবি তোলা যে সেখানে 'হিন্দু মন্দির' ছিল। এ হল বিশ্ব অযোধ্যা, কাশী এবং মথুরার তিনটি স্থানই মন্দির নির্মাণের জন্য হিন্দুদের হাতে হস্তান্তর করার জন্য হিন্দু পরিষদের সেই পুরানো স্লোগান। স্থানীয় আদালত মামলা গ্রহণ করেছে এবং মসজিদের প্রাঙ্গণে সমীক্ষার নির্দেশ দিয়েছে যাতে আগে কোনও মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল কিনা তা নিশ্চিত করা যায়। সর্বোচ্চ স্তরের বিচার বিভাগীয় যোগসাজশের মাধ্যমেই এমন নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। দেশের সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড় ঐ সমীক্ষার অনুমতি দিয়েছিলেন এই বলে যে এতে ১৯৯১ সালের উপাসনালয় আইনের বিধান লঙ্ঘন হচ্ছে না। এর ফলে এখন সম্ভাল এবং আজমেরেও একাধিক আইনি মামলা দায়ের করা শুরু হয়েছে।

২.২১ রাম নবমী, হনুমান জয়ন্তী এবং গণেশ পূজার মতো উৎসবে আয়োজিত ধর্মীয় মিছিলকে সংখ্যালঘু এলাকায় প্রবেশ করিয়ে উস্কানিমূলক আচরণ করে সংঘর্ষের সৃষ্টি করা, বিশেষ করে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসমস্ত ঘটনায়, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যরাই পুলিশি নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। উত্তরপ্রদেশে মুসলমান মানুষজনের ঘরবাড়ি ভাঙার জন্য বুলডোজার ব্যবহার করা শুরু হয়, যা মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, দিল্লি ইত্যাদি এলাকাতেও ছড়িয়ে

পড়েছে। এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসবের সময় সংখ্যালঘুদের উপর এ ধরনের হামলা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বরং সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ও বিভাজনকে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যেই পরিকল্পিত ঘটনা। হিন্দুত্ববাদী চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলি সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে হিংসায় লিপ্ত হয় এবং এ কাজে তারা রাষ্ট্রীয় সমর্থনও পায়। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্তদেরই শাস্তি দেওয়া হয়।

২.২২ এই পর্বে বিজেপি শাসিত রাজ্যে সংখ্যালঘুদের নিশানা করে আরও কিছু আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, ইতিপূর্বে বিদ্যমান কিছু আইনকে আরও কঠোরভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, উত্তর প্রদেশে, 'লাভ জিহাদ' নামে পরিচিত আন্তঃধর্মীয় বিবাহের জন্য এখন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি দেওয়া হবে। মুসলমানদের উসকানোর জন্য 'ভূমি জিহাদ' এবং 'খাদ্য জিহাদ'-র মতো নতুন নতুন শব্দ তৈরি করা হয়েছে। আসামের বিজেপি সরকার এ ক্ষেত্রে অন্য সকলের চাইতে এগিয়ে গেছে। উত্তরাখণ্ডের মতো কম জনসংখ্যার রাজ্যেও মুসলমানদের দোকান বন্ধ রাখার হুমকি দেওয়া হচ্ছে, মুসলমান ব্যবসায়ীদের বয়কটের আহ্বান জানানো হয়েছে।

২.২৩ হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলির সংখ্যালঘু-বিরোধী কর্মসূচি খ্রিস্টানদেরও নিশানা করছে। ২০২৪ সালে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে ৮৩৪টি হিংসার ঘটনা ঘটেছে। ২০২৩ সালে এমন ঘটনার সংখ্যা ছিল ৭৩৪। গির্জার উপর আক্রমণ, প্রার্থনা সভা, সমাজচ্যুতকরণ এবং কঠোর ধর্মান্তর বিরোধী আইনসমূহ ব্যবহার করে ফৌজদারি মামলা দায়ের করার মাধ্যমে খ্রিস্টানদের হয়রানি করা হচ্ছে। ধর্মান্তরিত সকল আদিবাসীকে তফসিলি উপজাতির মর্যাদা থেকে বাদ দেওয়ার দাবিতে আরএসএস-এর সাথে যুক্ত সংগঠনগুলি খ্রিস্টান আদিবাসীদের বিরুদ্ধে প্রচার করছে।

কর্তৃত্ববাদী শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা

২.২৪ ২৩তম পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, গণতন্ত্রবিরোধী বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে কর্তৃত্ববাদের সুসংহতকরণ চলছে। গত তিন বছরে সেই প্রবণতাগুলি তীব্রতর হয়েছে। সংসদকে সংকুচিত করা, বিচার বিভাগকে দুর্বল করা এবং নির্বাচন কমিশনের স্বাধীন মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার জন্য আরও কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল।

২.২৫ সংসদে বিরোধী দলের অধিবেশন কার্যত স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। মণিপুরে জাতিগত হিংসার মতো উদ্বেগের বিষয়সহ জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে আলোচনার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এক অভূতপূর্ব পদক্ষেপ হিসাবে, ২০২৩ সালে শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন সংসদের উভয় কক্ষের ১৪৬ জন বিরোধী সাংসদকে বরখাস্ত হয়। গুরুত্বপূর্ণ একাধিক বিলগুলিকে আলোচনার জন্য সংসদীয় কমিটিতে পাঠানো হয়নি। সেগুলিকে পাস করানোর জন্য রেলপথে পাঠানো হয়। হিন্দু ধর্মীয় রীতিনীতি পালন সহ স্পিকারের আসনের

পিছনে একটি 'সেনগোল' স্থাপনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী দেশের নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধন করেন।

২.২৬ ইউএপিএ এবং পিএমএলএ-র মতো দানবীয় আইনকে বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল। হয় বিজেপিতে যোগদান করতে বাধ্য হও অথবা কারাগারে যেতে প্রস্তুত থাকো। দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই প্রথম লোকসভা নির্বাচনের আগে ঝাড়খণ্ড এবং দিল্লি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছিল। সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার, আটক করা হয়েছে, স্বাধীন গণমাধ্যমকে নিশানা করার ঘটনা অব্যাহত ছিল। পূর্ববর্তী ফৌজদারি আইন প্রতিস্থাপনের জন্য তিনটি ফৌজদারি আইন সংসদে কোনোরকম আলোচনা ছাড়াই পাস করিয়ে নিয়ে কার্যকর করা হয়েছে। এই তিনটি আইনের সুবাদে কাউকে হেফাজতে নেওয়ার ক্ষেত্রে পুলিশের ক্ষমতা বেড়েছে এবং রাষ্ট্রদ্রোহের মতো কঠোর ধারাগুলিকে অপরাধ হিসাবে উল্লেখ না করেই সম্প্রসারিত করা হয়েছে। টেলিকমিউনিকেশন আইন কার্যকর হয়েছে, এর জোরে রাষ্ট্রীয় নজরদারির কাঠামোটি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে, নাগরিকদের গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘন করা হবে।

২.২৭ কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে সরকার উচ্চতর আদালতের বিচারক বা উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতিদের নিয়োগ সংক্রান্ত অনেক ক্ষেত্রেই সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়ামের সুপারিশকে বাস্তবায়ন করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে উচ্চতর বিচারবিভাগকে দমন করার চেষ্টা করেছে। এমন পদক্ষেপে উচ্চতর বিচার বিভাগ ক্রমশ 'কার্যনির্বাহী' বিচার বিভাগের ন্যায় আচরণ করছে।

নির্বাচন কমিশনকে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা

২.২৮ নির্বাচন কমিশনের স্বায়ত্তশাসিত মর্যাদা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। সংসদ কর্তৃক পাস হওয়া প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ সংক্রান্ত আইনটি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরিপন্থী। ঐ আইনে নির্বাচন কমিটিতে সরকারি নির্বাহী বিভাগকেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাইয়ে দেয়। বিজেপি নেতৃত্বের সাম্প্রদায়িক প্রচারের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন হস্তক্ষেপ করা বন্ধ করেছে। নির্বাচনের সময়সূচি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও নির্বাচন কমিশন সরকারি কার্যনির্বাহী বিভাগের নির্দেশের প্রতি নমনীয় হয়ে উঠছে। নির্বাচন পরিচালনার প্রক্রিয়া অস্বচ্ছ হয়ে পড়ছে, অপ্রকাশিত ফলাফলে অসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে যেমন ভোটগ্রহনের সময় নথিভুক্ত হওয়া এবং গণনার সময় মোট ভোটের সংখ্যায় বিস্তৃত ব্যবধান ঘটছে। ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন এবং বাদ দেওয়া, ইভিএমের কার্যকারিতা সবকিছুতেই প্রশ্ন উঠছে।

২.২৯ ক্ষমতাসীন দলের তহবিলে দুর্নীতির কৌশলে কর্পোরেটদের তরফে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ব্যবহৃত নির্বাচনী বন্ড প্রকল্পটি ২০২৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক অসাংবিধানিক বলে বাতিল করা হয়। এই রায় সিপিআই(এম)-এর সেই অবস্থানকে সমর্থন করে, যারা শুরুতেই নির্বাচনী বন্ড

গ্রহণ করবে না বলে শুধু ঘোষণাই করেনি বরং সুপ্রিম কোর্টে সেই প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জও করেছে। নির্বাচনী বন্ড বাতিল করা সত্ত্বেও, ভোটারদের প্রভাবিত করতে, ভোটদানের প্রক্রিয়াকে বিকৃত করার জন্য নির্বাচনের সময় বিভিন্ন স্তরে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়িক সংস্থার সম্পর্কই সেও অবৈধ তহবিলের উৎস। নির্বাচনী প্রক্রিয়া সংস্কারের প্রশ্নটি এমন পরিস্থিতিতে জরুরি হয়ে পড়েছে। নির্বাচনী ব্যবস্থায় অর্থশক্তিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ধ্বংসসাধন

২.৩০ যাবতীয় ক্ষমতা নিজেদের হাতে কেন্দ্রীভূত করার উদ্দেশ্যে মোদী সরকার দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙে সাংবিধানিক রীতিনীতিকে অবৈধ ঘোষণা করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজস্ব আদায়কে একজায়গায় আনার মাধ্যমে মোদী সরকার কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতার বন্টনকে পুনঃসংজ্ঞায়িত করেছে। কর বাবদ আয়ের কেন্দ্রীয় তহবিলের আনুপাতিক বন্টনে হ্রাস, রাজ্যগুলিকে প্রাপ্য সম্পদের অধিকার দিতে অস্বীকৃতি এবং জিএসটি-ক্ষতিপূরণ অব্যাহত না রাখার মতো পদক্ষেপ নেওয়ার মাধ্যমে বিরোধীদের শাসনাধীন রাজ্যের জন্য এক আর্থিক সংকটের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কেন্দ্রীয় করে রাজ্যের অংশিদারিত্ব হ্রাস পেয়েছে। বছরের পর বছর ধরে কেন্দ্রীয় বাজেটে রাজ্যগুলির প্রাপ্য বরাদ্দে হ্রাসের মাধ্যমেই সেই নীতি প্রতিফলিত হয়েছে। ২০১৬ সালে কেন্দ্রীয় বরাদ্দে রাজ্যগুলির অংশ ছিল ৪১.১ শতাংশ, ২০২৩ সালে তাকে ৩৫.১ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। অ-বিভাজ্য সেস এবং সারচার্জের উপর কেন্দ্রের ক্রমবর্ধমান নির্ভরতা রাজ্যগুলির সাথে ভাগ করে নেওয়া সামগ্রিক বন্টনকেই হ্রাস করেছে। সম্পদের পরিমাণ হ্রাসের সাথে সাথে, রাজ্যগুলির তরফে ঋণ নেওয়ার উপর ক্রমবর্ধমান বিধিনিষেধের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এর ফলে রাজ্য সরকারের তরফে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এবং জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপের জন্য সম্পদ সংগ্রহ করতে বাধা পাচ্ছে।

২.৩১ দ্বিতীয়বারের জন্য নির্বাচিত হওয়ার পর বিরোধীদের দ্বারা শাসিত রাজ্যগুলিতে রাজ্যপালদের মাধ্যমে মোদী সরকারের হস্তক্ষেপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্যপালেরা রাজ্য সরকার এবং আইনসভার ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছেন। উপাচার্যদের যথেচ্ছ নিয়োগ, বিধানসভায় পাস হওয়া আইন অনুমোদনে অস্বীকৃতি জানানো এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তলব করে রাজ্য সরকারকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের মৌলিক কাঠামোকে দুর্বল করার জন্য রাজ্যপালদের ব্যবহার করা হচ্ছে। ন্যূনতম কেন্দ্রীয় সহায়তার একটি পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় প্রকল্প হিসাবে চিহ্নিত করে অন্যান্য সমস্ত প্রকল্পের তহবিল বন্ধ করার হুমকি দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলির উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিকে আত্মসাৎ করার চেষ্টা করছে।

২.৩২ বিজেপি যে তার কেন্দ্রীকরণ অভিযান অব্যাহত রাখবে 'এক জাতি, এক নির্বাচন' (ওয়ান নেশন, ওয়ান ইলেকশন) ব্যবস্থা থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। লোকসভা এবং সমস্ত রাজ্য বিধানসভায় একযোগে নির্বাচনের জন্য সংসদে একটি 'সাংবিধানিক সংশোধনী বিল' সহ কেন্দ্রীয় সরকার আরেকটি বিলও পেশ করেছে। এ ধরনের ব্যবস্থা রাজ্যগুলির অধিকার এবং পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত সরকারের সাংবিধানিক নিশ্চয়তাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করবে।

২.৩৩ হিন্দুত্ব ও বৃহৎ কর্পোরেটদের মধ্যে এমন আঁতাতের শক্তিই কেন্দ্রীকরণের অভিযানকে ইন্ধন জোগাচ্ছে। অতএব, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও রাজ্যের অধিকার সুরক্ষিত রাখতে স্বৈরাচারবিরোধী, হিন্দুত্ববিরোধী সংগ্রামে অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত অ-বিজেপি রাজ্য সরকারগুলিকে নিজেদের অধিকারের সুরক্ষার জন্য একটি ফ্রন্ট গড়ে ঐক্যবদ্ধ হতে সক্রিয় হতে হবে।

জম্মু ও কাশ্মীর : গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপরে আঘাত

২.৩৪ জম্মু ও কাশ্মীরে যা ঘটেছে সেসব বিজেপি সরকারের চরম গণতন্ত্রবিরোধী, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতীক। ২০১৯ সালে ৩৭০ ধারা বাতিল সহ জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা কেড়ে নেওয়ার পর, রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন চালানো, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নাগরিকদের অধিকার অস্বীকার করা স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে ওঠে। স্থায়ী বাসিন্দাদের স্থায়ী অবস্থান ও ভূমির অধিকার অপসারণের ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছিল। নতুন বিধানসভায় উপত্যকার প্রতিনিধিত্ব হ্রাস করার জন্য নির্বাচনী ক্ষেত্রের নতুন সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছিল। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ভাঙার ঘটনাকে চ্যালেঞ্জের আপীল খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং নির্বাচিত রাজ্য আইনসভার অধিকারের উপর আঘাত হানে।

২.৩৫ অবশেষে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে বিজেপির সকল ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও বিধানসভা নির্বাচনে ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতৃত্বাধীন জোট স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। খুব সীমিত ক্ষমতা নিয়ে ওমর আবদুল্লাহ সরকার ক্ষমতাসীন হয়। তবে সুপ্রিম কোর্টের সমীপে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে পেশ করা বক্তব্য অনুযায়ী রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস এখনও পূরণ হয়নি। এদিকে লাদাখে ষষ্ঠ তফসিলের মর্যাদা এবং স্বায়ত্তশাসন অর্জনের জন্য একটি জনপ্রিয় আন্দোলন চলছে। বিশেষ মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সাথে ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক শক্তির লক্ষ্য হল অবিলম্বে রাজ্যের মর্যাদা অর্জন করা।

মণিপুর : সঙ্কটের গভীরতা বৃদ্ধি

২.৩৬ ২০২৩ সালের ৩ মে তারিখে মণিপুরে জাতিগত হিংসার ঘটনা শুরু হওয়ার কুড়ি মাস পরেও সেখানকার পরিস্থিতি ভয়াবহ। অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, অপহরণ এবং নিরপরাধ মানুষকে হত্যার মতো জঘন্য কাজ সংগঠিত হয়েছে। এ সংঘাতে

এখনও পর্যন্ত ২৫০ জন নিহত হয়েছে এবং ৬০,০০০ ঘরছাড়া মানুষ আশ্রয় শিবিরে বসবাস করছেন। রাজ্য এবং কেন্দ্রের দুই বিজেপি সরকারই সে রাজ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী একবারও মণিপুর সফর করেননি, এই সংঘাতের আবহে নিজের দলের ভূমিকা নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিংকে এখনও অপসারণ করা হয়নি। নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েনে বিলম্ব করা ছাড়াও জনগণের প্রতিনিধি, রাজনৈতিক দল এবং সংঘাতে জড়িত বিভিন্ন জাতিগত গোষ্ঠীর সাথে আলোচনা শুরু করার জন্য কোনও উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

২.৩৭ কেন্দ্র মনে হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার নিজেদের নিষ্ক্রিয়তার বিপজ্জনক পরিণতি সম্পর্কে অজ্ঞ, যা মণিপুরে সংঘাতের পরিস্থিতিকে আরও বাড়িয়ে দেওয়া সহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে শান্তির জন্য হুমকির বিপদ তৈরি করছে। অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে হস্তক্ষেপ করে বীরেন সিংকে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে অপসারণ করতে হবে এবং সংঘাতে জড়িত সকল পক্ষের সাথে আলোচনা শুরু করতে হবে যাতে সকল সম্প্রদায়ের অধিকার সুরক্ষিত হয়, সে রাজ্যে শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা পুনরুদ্ধার করা যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে গৃহীত উপযুক্ত পদক্ষেপের অভাব জনগণের মধ্যে আস্থার পুনরুদ্ধার এবং শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি তৈরিতে বাধা সৃষ্টি করেছে।

বিদেশনীতি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে

২.৩৮ দ্বিতীয়বারের জন্য নির্বাচিত হওয়ার পরে মোদী সরকার অনুসৃত বিদেশনীতির মূল কথা ছিল কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় বজায় রেখে চলা। দ্বিতীয়বারের জন্য ট্রাম্পের রাষ্ট্রপতিত্ব গ্রহণের পরও তা অব্যাহত থাকবে। ইউক্রেন-রাশিয়া সংঘাত ব্যতিরেকে যেখানেই ভারত নিরপেক্ষ অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করেছে, ভারতের বিদেশনীতি ব্যাপকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূ-রাজনৈতিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে স্পষ্ট হয়েছে। ইউক্রেনের প্রতি ভারতের অবস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অসন্তোষের কারণ হয়েছে, তা সত্ত্বেও ভারত তাদের জন্য গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে কারণ এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীন-বিরোধী জোটে ভারতের ভূমিকাকে তারা বাড়তি গুরুত্ব দেয়। কোয়াড-কে সারা দুনিয়ার শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির এক শীর্ষ সম্মেলনের স্তরে উন্নীত করা হয়েছিল। এই কূটনৈতিক জোটকে একটি নিরাপত্তা ও কৌশলগত জোটে রূপান্তর করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টায় মোদী সরকার সম্মতি জানিয়েছিল। সমালোচনামূলক ও বিকাশমান প্রযুক্তি (২০২২), সরবরাহ এবং পারস্পরিক প্রতিরক্ষা সংগ্রহ ব্যবস্থা (২০২৩) চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ভারত মার্কিন প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা বলয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে। গত সাত বছরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ভারত ১৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের অস্ত্র কিনেছে।

২.৩৯ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ভারত-ইজরায়েল জোটের তরফে গাজার বিরুদ্ধে গণহত্যামূলক যুদ্ধে ইজরায়েলকে নির্লজ্জের মতো সমর্থন জানানো হয়েছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিনিদের সমর্থনকারী দেশ হিসাবে গৃহীত প্রস্তাবে সমর্থন জানানোয় ভারত বিরত থেকেছে। ভারত ইজরায়েলে অস্ত্র ও গোলাবারুদ রপ্তানি করছে, যা গাজায় যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হয়। আইটুইউটু (ভারত, ইসরায়েল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সংযুক্ত আরব অ্যামিররেটস) এবং আইএমইসি (ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ জুড়ে নির্মিত অর্থনৈতিক করিডোর) হল দুটি মার্কিন-পন্থী গোষ্ঠী যা ভারতের বিদেশনীতিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যেই তৈরি করা হয়েছে, বিশেষ করে পশ্চিম এশিয়ায়। ব্রিকস এবং সাংহাই কর্পোরেশন অর্গানাইজেশনে ভারতের সদস্যপদ বিশ্বের ক্রমবর্ধমান বহু-মেরুত্বেরই স্বীকৃতি। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক ক্রমবর্ধমান বহু-মেরুত্বের সমস্ত সুযোগ ব্যবহারের জন্য ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর।

শিক্ষার সুযোগ সঙ্কুচিত হওয়ার প্রসঙ্গে

২.৪০ গত তিন বছরে সবচেয়ে ভয়াবহ আক্রমণের শিকার হয়েছে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা। এ আক্রমণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষার সুযোগে তীব্র অবক্ষয়। শিক্ষার অধিকার আইনের সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে হাজার হাজার সরকারি স্কুলকেই 'অকার্যকর' বলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এতে আশেপাশের এলাকার স্কুলগুলিকে ভর্তি হতে শিক্ষার্থীদের বাধ্য করা হয়েছে। কেরালার মতো উল্লেখযোগ্য একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বত্রই বেসরকারিকরণের ফলে সরকারি স্কুল থেকে বেসরকারি স্কুলে শিক্ষার্থীদের স্থানান্তরিত হতে হচ্ছে। স্নাতকোত্তর প্রতিষ্ঠানগুলিতেও একই নীতি প্রয়োগ করা হয়েছে, যার ফলে বহু কলেজ বন্ধ হওয়ার হার তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ হ্রাস করতে মোদী সরকারের সামগ্রিক প্রচেষ্টায় কেন্দ্রীয় তহবিলে ছাঁটাই থেকে শুরু করে উপযুক্ত অর্থের অভাবই এমন প্রতিকূল অবস্থার একটি মূল কারণ। কোভিড-১৯ মহামারীর পর বৃহৎ আকারে এবং দীর্ঘস্থায়ী লকডাউনের মাধ্যমে এহেন নীতি কার্যকর করতে জোর দেওয়া সহজ হয়েছে।

২.৪১ শিক্ষাক্ষেত্রে আক্রমণের আরেকটি বৈশিষ্ট হল বিজ্ঞান, বিজ্ঞান মনস্কতা ও যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনার উপর ব্যাপক আক্রমণ নামিয়ে আনা। বিশ্বাস-ভিত্তিক বিষয়বস্তুকে প্রচার করা হচ্ছে যা কর্তৃত্ববাদী এবং ফ্যাসিবাদী নীতির দিকে অগ্রসর হওয়ারই একটি অন্যতম লক্ষণ। এদিকটি কেবল সাম্প্রদায়িক এবং পরিচয়-ভিত্তিক ঘৃণার প্রবণতাকেই উৎসাহিত করে না বরং সাধারণতান্ত্রিক কাঠামো ও নাগরিকদের গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ পরিচয়কে হিন্দুত্ব-ভিত্তিক পরিচিতির নিরিখে পুনর্নির্ধারণ করে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবধি বিস্তৃত এই বিশেষ মনোভাব আসল উদ্দেশ্য যে প্রতিষ্ঠানের নীতি-নির্ধারক সংস্থা সহ প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়োগ প্রক্রিয়াকে দখলের জন্য তা স্পষ্টতই লক্ষ্য করা গেছে।

২.৪২ সরকারি তহবিল প্রত্যাহার করার ফলস্বরূপ সৃষ্ট সম্পদের বিরাট ঘাটতি মেটাতে এখন মুনাফার জন্য ব্যাপক কর্পোরেট বিনিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের কাজ পরিচালনায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের যৌথ পরিচালন পদ্ধতিকে বাতিল করে ডিজিটাল নির্দেশনার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এর প্রভাবে শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা কর্পোরেটদের দ্বারা প্রচারিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের করুণার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

২.৪৩ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বাস্তবায়নের সাথে সাথেই শিক্ষাক্ষেত্রে চরম কেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে, যা যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতিসমূহকে চূড়ান্তভাবে অবমূল্যায়ন করে। কেন্দ্রীকরণের একটি মূল উপাদান হল আচার্য পদের অপব্যবহার। ঐ পদে আসীন রাজ্যপালেরা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মসূচিকে এগিয়ে দিতে সরকারের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছেন, যা আমাদের সাংবিধানিক রীতিনীতির স্পষ্ট লঙ্ঘন। ইউজিসি'র প্রকাশিত খসড়া নির্দেশিকাগুলিতে রাজ্য সরকার পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্য নির্বাচনের দায়িত্বও রাজ্যপালকে দেওয়া হয়েছে। অনেক রাজ্যেই কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র ইউনিয়নকে অনুমোদন দেওয়া হয়নি।

স্বাস্থ্য পরিষেবার বেসরকারিকরণ

২.৪৪ সাম্প্রতিক সময়ে ভারতে জনস্বাস্থ্য পরিষেবা বেশ কয়েকটি প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে। জাতীয় অর্থনীতির প্রধান প্রধান বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা বাবদ সরকারি বরাদ্দ ইতিমধ্যেই সর্বনিম্ন ছিল। সম্প্রতি সেই বরাদ্দে জনসাধারণের অংশ আরও কমানো হয়েছে এবং খরচের বোঝা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবা ও মেডিক্যাল শিক্ষায় কর্পোরেটাইজেশন ও মুনাফাখোরির মাত্রা অবিশ্বাস্য পর্যায়ে পৌঁছেছে। পিএমজেএওয়াই-র মতো বিমা-স্কিমের মাধ্যমে বেসরকারি পরিষেবায় সরকারি অর্থের ব্যবহার স্বাভাবিক ব্যবস্থা হয়ে উঠেছে। এমন বন্দোবস্তে দুর্নীতি একটি প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা দিয়েছে, অন্যদিকে জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামো সহ যাবতীয় জনস্বাস্থ্য পরিষেবাগুলি দুর্বল হয়ে পড়েছে। সরকারি ওষুধ ও স্বাস্থ্য-প্রযুক্তিক্ষেত্র পদ্ধতিগতভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে, যেখানে দুর্বলভাবে নিয়ন্ত্রিত কর্পোরেট সংস্থাগুলি একচেটিয়া অধিকার কায়েম করেছে। এমনকি গবেষণা ও উন্নয়নকেও বেসরকারি খাতে সহযোগীদের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে, ভ্যাকসিনও এর মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন পেশায় স্বাস্থ্য বিষয়ক ঝুঁকি ক্রমশ বাড়ছে, গিগ অর্থনীতিকে এরই মধ্যে বিবেচনা করতে হবে। ডিজিটালাইজেশন এবং সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি-কেন্দ্রিক সংস্কারগুলি ইতিমধ্যেই বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে আরও প্রান্তিক করে তুলছে। জনগণের স্বাস্থ্যের অবস্থা বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের জন্য পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে। সার্বিক জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার তীব্র অবনতি ঘটছে। কোভিড মহামারীর সময়কার ভয়াবহ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও, সরকারের এমনসব নীতি যাতে দেশের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার দেউলিয়া অবস্থা পুরোপুরি উন্মোচিত হয় সেসবই ঘটছে।

২.৪৫ সাংবিধানিক নীতি অনুসারে স্বাস্থ্য রাজ্যের অধিকারভুক্ত বিষয় হওয়া সত্ত্বেও, রাজ্য সরকারের তরফে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার চেষ্টায় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে দুর্বল করে অর্থনৈতিক বাধা তৈরি করা হচ্ছে। দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে মিথ্যা দাবি সহ প্রচার চলছে, অথচ জবাবদিহি চাইবার দাবির পথ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। অতি প্রয়োজনীয় পর্যায়ক্রমিক স্বাস্থ্য সমীক্ষাগুলির অবমূল্যায়ন ও সেসবের তথ্যে গরমিল করা হয়েছে। ওষুধ খাতে সরকার এমন নীতি অনুসরণ করে চলেছে যাতে কর্পোরেট সংস্থাগুলি অতি মুনাফা অর্জন করতে পারে। বহুজাতিক কোম্পানি নির্মিত পেটেন্টযুক্ত ওষুধের অত্যধিক মূল্যকে চ্যালেঞ্জ না করেই প্রয়োজনীয় ও পেটেন্টহীন ওষুধের দামে বিশাল বৃদ্ধির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। জনস্বাস্থ্যের অধিকার এবং জনসাধারণের অর্থে পরিচালিত স্বাস্থ্যপরিষেবায় সর্বজনীন প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্দোলন-সংগ্রামকে বিকল্প নীতির অংশ হিসাবেই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

সংস্কৃতির উপরে আক্রমণ

২.৪৬ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আরএসএস নিজেদের উপাদানের অনুপ্রবেশ করিয়ে তার উপরে আধিপত্য বৃদ্ধি করেছে। তারা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় ইতিহাসের পুনর্লিখন করতে চায়, পৌরাণিক কাহিনীকে বাস্তব ইতিহাস হিসাবে তুলে ধরতে চায়। ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে অ-হিন্দুদের ভূমিকা ও অবদানকে ক্ষুণ্ণ ও অস্বীকার করা হচ্ছে। সমাজ সংস্কার এবং জাতীয় আন্দোলনের ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল উত্তরাধিকারকে কলঙ্কিত করা হচ্ছে। ভুয়ো আখ্যান ব্যবহার করে মিথ্যা গর্বের অনুভূতি প্রচার করা হচ্ছে। হিন্দুত্বের সাম্প্রদায়িক কর্মসূচি সফল হতে পারে না যতক্ষণ না তা বৃহত্তর জনগণের 'সাধারণ জ্ঞানের' অংশ হয়ে ওঠে। এর জন্যই জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক মাধ্যমে প্রচার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চলচ্চিত্র, টেলিভিশন চ্যানেল সহ বিভিন্ন ওটিটি প্ল্যাটফর্ম, জনপ্রিয় সঙ্গীত এবং এমনকি সম্প্রতি উচ্চমার্গের শিল্পেও অনুপ্রবেশের মাধ্যমে সেসবকে নিয়ন্ত্রণের জন্য তাদের নিরলস প্রচেষ্টা ঐ কারণেই। সর্বভারতীয় স্কেলে আঞ্চলিক বা স্থানীয় ধর্মীয় উৎসবগুলির উদযাপনেও এক সমজাতীয় 'হিন্দু' পরিচিতি তৈরি ঐ প্রচেষ্টারই অংশ। যুক্তির উপর আক্রমণ নামিয়ে আনা থেকে যুক্তিবাদের অবমূল্যায়ন দ্রুতগতিতে অব্যাহত রয়েছে। ধারনাগত অস্পষ্টতা, কুসংস্কার, সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ, পুরুষতন্ত্র, বিদ্বেষ এবং জাতিগত 'পবিত্রতা' এবং 'দূষণ'-এর যাবতীয় ধারণাই হল সেই জমি যেখানে হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ বৃদ্ধি পায়, বিকশিত হয়। অযৌক্তিক এবং অবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের নিরর্থক আলোচনা আজ রাষ্ট্রীয় সমর্থন পাচ্ছে এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রচারিতও হচ্ছে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হিন্দুত্ববাদী কর্মসূচির মোকাবিলা করার

জন্য সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ এবং প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীসহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের এক দীর্ঘমেয়াদী ও সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

সংবাদমাধ্যমের উপর দখল প্রসঙ্গে

২.৪৭ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া মূলধারার গণমাধ্যমের উপরে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়েছে। কর্পোরেট গণমাধ্যমের মালিকরা সরকারের সাথে একজোট হয়ে নিজেদের টিভি চ্যানেলে সাম্প্রদায়িক প্রচার চালাচ্ছে। পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির দ্বারা স্বাধীন গণমাধ্যম এবং ডিজিটাল গণমাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলিকে ভয় দেখানো হচ্ছে। নিউজক্লিককে নিশানা করে যে ভীতির পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল তা ছিল এক সতর্কবার্তা। ২০২৩ সালে প্রণীত তথ্যপ্রযুক্তি বিধির সংশোধনী অনুসারে গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ ও সেন্সর করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চলছে, এই সংশোধনীর মধ্যে কিছু আইনকে বোম্বে হাইকোর্ট স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে। ২০২৪ সালের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকের হিসাবে (প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স) ১৮০টি দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান ১৫৯তম।

মহিলাদের অবস্থা : বিজেপি শাসনে দুর্দশার চিত্র

২.৪৮ দেশের মহিলাদের সাথে মোদী সরকার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সংসদে মহিলা সংরক্ষণ বিলটি গ্রহণ করার নাটকীয় উপস্থাপনা করে বাস্তবে এই আইনকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিলম্বিত করে রেখেছে। ভ্রান্ত ও অপ্রয়োজনীয় যুক্তি সাজিয়ে এ আইনকে দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া রাখা জাতীয় আদমশুমারির কাজ এবং দীর্ঘমেয়াদী ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। ফলস্বরূপ ভারতের সংসদ ও বিধানসভায় মহিলাদের সংখ্যা এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সবচেয়ে কম।

২.৪৯ এই সময়কালে, বেশ কিছু রাজ্য সরকার মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১০০০ থেকে ১৫০০ টাকার অর্থ স্থানান্তর প্রকল্পের মাধ্যমে 'নারী সহায়তার ভিত্তি' তৈরি করার চেষ্টা করেছে। সাধারণ মহিলাদের অর্থনৈতিক অবস্থা এতই সঙ্কটগ্রস্থ যে এমন অল্প পরিমাণ অর্থও মহিলাদের জীবনে যথেষ্ট পার্থক্য তৈরি করে এবং ভোটদানের সময় রাজনৈতিক প্রভাব ফেলে। এপ্রসঙ্গে হস্তক্ষেপের সময় আমাদের অবশ্যই 'মহিলাদের মধ্যে' এ ধরণের প্রকল্পের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার প্রতি সংবেদনশীল থাকতে হবে। বিজেপি'র দৃষ্টিভঙ্গি হল মহিলাদের 'সাংবিধানিকভাবে সমান নাগরিক অধিকারের অধিকার' দেওয়ার বদলে শুধুমাত্র 'এ ধরণের প্রকল্পের উপর নির্ভরশীল' 'সুবিধাভোগী'তে পরিণত করা। মহিলাদের এ ধরণের প্রকল্পে অংশগ্রহণে সহায়তা করার পাশাপাশি, 'নারী অধিকারের সংগ্রামকে শক্তিশালী করা' প্রয়োজন, এর মধ্যে পারিবারের টিঁকে থাকার জন্য তাদের কাজের স্বীকৃতিও অন্তর্ভুক্ত।

২.৫০ বাস্তব পরিস্থিতি হল ভারতে মহিলারা গৃহস্থালির কাজে, পারিবারিক জমি বা ছোটখাটো উদ্যোগে কিংবা অবৈতনিক কৃষিকাজে বিশাল অনাদায়ী শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত থাকেন। ভারতের স্টেট ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক ইকোর্যাপ প্রতিবেদন অনুসারে, ভারতে মহিলাদের 'অনাদায়ী গৃহস্থালির কাজের' জিডিপিতে মোট অবদান ২২.৭ লক্ষ কোটি টাকা, যা দেশের জিডিপি'র ৭.৫ শতাংশ। ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি, মহিলাদের মধ্যে বেকারত্বের উচ্চ হার এবং এমএনরেগায় বরাদ্দ তহবিল হ্রাসের ফলে গ্রামাঞ্চলে কর্মদিবস হ্রাস পেয়েছে। এই ঘটনা নারীদের উপর বিপর্যয়কর প্রভাব ফেলেছে, তারা উচ্চ হারে সুদ সহ ঋণ নিতে বাধ্য হচ্ছেন, প্রায়শই তাদের ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হতে হচ্ছে। তারা অর্থলোভী ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলির করুণার জোরে টিঁকে থাকার চেষ্টা করছেন।

২.৫১ মোদী শাসনের এক দশকে, নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে ২৮ শতাংশ। এনসিআরবি জানিয়েছে ২০২২ সালে প্রতি ঘণ্টায় মহিলাদের বিরুদ্ধে গড়ে ৫০টি অপরাধ সংঘটিত হয়, প্রতিদিন ৮৮ জন মহিলাকে ধর্ষণ করা হয় যার মধ্যে ১১ জন ছিলেন দলিত। এসমস্ত ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার হার হতাশাজনক, প্রতি ১০০টি ধর্ষণের ঘটনায় ৭৫ জন অভিযুক্তই ছাড়া পেয়ে যায়। অনেক গুরুত্বপূর্ণ মামলায়, যেমন মহিলা কুস্তিগীরদের ক্ষেত্রে বিজেপি সরকার প্রকাশ্যেই অভিযুক্তদের সুরক্ষা দিয়েছে। বিজেপি শাসনে ভারত মহিলাদের জন্য সবচেয়ে কম নিরাপদ দেশগুলির মধ্যে অন্যতম একটি।

২.৫২ 'ডবল-ইঞ্জিন' বন্দোবস্তের বারোটি রাজ্য সরকার এমন আইন গ্রহণ করেছে যা একজন মহিলাকে নিজের পছন্দের সঙ্গী বেছে নেওয়ার অধিকারকে বাতিল করে দেয় যদি সেই সঙ্গী অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের হয়। উত্তরাখণ্ডে গৃহীত আইন যাকে বিজেপি একটি মডেল হিসেবে উপস্থাপিত করে সেই ইউসিসি লিভ-ইন সম্পর্কের মতো সম্মতিমূলক যৌন সম্পর্ককে অপরাধ হিসাবে প্রতিপন্ন করে এবং একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাকে নিজের জীবনযাপনের পথ নির্ধারণের মৌলিক অধিকারের বিরুদ্ধে যায়। বিজেপি জোর দিয়ে বলে আসছে যে উপজাতি সম্প্রদায়গুলিকে এর আওতা থেকে দূরে রাখা হবে, এভাবে প্রমাণিত হয় যে ইউসিসি আদৌ মহিলাদের অধিকারের জন্য নয় বরং মুসলমান সম্প্রদায়কে নিশানা করার জন্যই পরিকল্পিত। বিজেপি নিজেদের আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুশীলন উভয় ক্ষেত্রেই মহিলাদের অধিকারের বিষয়ে এক শক্তিশালী বিরোধী হিসেবে প্রমাণিত। এদের আদর্শ ও অনুশীলন উভয়ই পিতৃতন্ত্রকে উৎসাহ যোগায়।

যুব প্রজন্ম: অপূর্ণ প্রত্যাশা প্রসঙ্গে

২.৫৩ ভারতে মোট জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশই বয়সে তরুণ। তাদের চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষা কীভাবে পূরণ করা হবে তার উপরেই নির্ভর করে দেশের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা নির্ধারিত হবে। অল্প শিক্ষিত তরুণদের এক বিরাট অংশ কর্মসংস্থানের উপযুক্ত

সুযোগ ও উন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে এমন কাজের অভাবে নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে ম্লান বলে মনে করছে। বিগত বছরগুলিতে ত্রুটিপূর্ণ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার আয়োজন এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে শিক্ষিত তরুণদের ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা গেছে। অগ্নিবীর প্রকল্পে নথিভুক্ত হয়েও সশস্ত্র বাহিনীতে নিয়মিত চাকরির সুযোগ না দেওয়ার প্রতিবাদে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমেছে। নিম্ন শ্রেণির সরকারি চাকরি সহ পাবলিক সেক্টরে চাকরি পাওয়ায় তাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার কারণ অন্যত্র কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা কম। বেশিরভাগ চাকরির সুযোগ অসংগঠিত ক্ষেত্রে, যাতে উপযুক্ত আয় কিংবা সামাজিক নিরাপত্তা কোনোটাই নেই। বেশিরভাগ তরুণ বয়স্ক নাগরিকরাই মাঝারি মাপের শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে এবং আজকের পরিস্থিতিতে তাদের কেউই মূল্যবান ক্যারিয়ার বা পেশা অর্জনে সফল হতে পারে না।

২.৫৪ তরুণ প্রজন্মের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক শূন্যতা বিরাজ করছে। সুস্থ ও প্রগতিশীল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ গ্রহণ করার পরিবর্তে তারা বাণিজ্যিক রুচি, ভোগবাদী ও স্বার্থপরতার মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। হিন্দুত্ববাদী শাসনকালে তীব্র সাম্প্রদায়িক ও বিভাজনের পরিবেশ নির্মাণ করা হচ্ছে। তরুণদের জন্য একটি বিকল্প কর্মসূচি সামনে আনা অপরিহার্য। এক সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা, গুনমানসম্পন্ন কর্মসংস্থান ও প্রকৃত অর্থে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের চাহিদাকে সেই কর্মসূচি পূরণ করবে। এই ধরনের একটি রাজনৈতিক মঞ্চ নির্মাণের সময়, বামপন্থীদের অবশ্যই দেশের যুবসমাজের সামনে সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে উপস্থাপন করতে হবে। একমাত্র এভাবেই সমাজে একটি মৌলিক রূপান্তর ঘটানো যাবে।

দলিত: অবস্থার অবনতি

২.৫৫ আরএসএস-বিজেপি-হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলি সনাতন ধর্মের আড়ালে মনুবাদী মতাদর্শকে পরিকল্পিতভাবে প্রচার করছে। তারা বর্ণবিভেদমূলক শ্রেণিবিন্যাস বজায় রেখেও বর্ণগত পরিচয়ের হেরফের করে দলিত এবং প্রান্তিক পরিচিতির মানুষকে হিন্দুত্ববাদী কাঠামোর মধ্যে টেনে আনতে চায়। নিপীড়িত বর্ণসমূহের মানুষকে একে অন্যের থেকে আলাদা করতে, তাদের উপরে নিজেদের রাজনৈতিক প্রভাব বাড়াতে এরা নিম্নবর্ণের সংখ্যালঘু পরিচিতিকে নিষ্ঠুরভাবে কাজে লাগায়। তাদের কৌশলের একটি অন্তর্নিহিত অংশ হল সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত বর্ণ সম্প্রদায়কে ব্যবহার করার প্রচেষ্টা চালানো। এ সমস্ত কৌশলের বিরুদ্ধে সামাজিক ন্যায়বিচার ও সামাজিক সংস্কারের বিপরীতে প্রতিরোধ আটকানোর জন্য সার্বিকভাবে বর্ণ ব্যবস্থা ও বর্ণভিত্তিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে বৃহৎ পরিসরে আন্দোলনের প্রয়োজন রয়েছে।

২.৫৬ বিজেপি এবং হিন্দুত্ববাদী শক্তির দ্বারা নির্মিত মনুবাদী পরিবেশে জাতিগত অত্যাচার

বেড়েছে। এনসিআরবি-র তথ্য অনুসারে, ২০২১ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে তফসিলি জাতিভুক্তদের (এসসি) বিরুদ্ধে অপরাধ ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২৬ শতাংশ মামলা নিয়ে এধরনের ঘটনায় উত্তরপ্রদেশ শীর্ষে রয়েছে, তারপরেই রাজস্থান (১৫ শতাংশ) এবং মধ্যপ্রদেশ (১৪ শতাংশ)।

২.৫৭ মোদী সরকারের আমলে বেসরকারিকরণ ত্বরান্বিত হয়েছে, বেসরকারি ক্ষেত্রে সংরক্ষণের সুযোগ না থাকা এবং কর্মসংস্থানের সার্বিক পরিস্থিতিতে সাংবিধানিক নির্দেশমত সংরক্ষণের সুবিধাকে দুর্বল করে দেওয়ার ফলেই গোটা কাজের ক্ষেত্রকে দুর্বল করে দিয়েছে। ২০২২ সালের হিসাবে তফসিলি জাতিভুক্তদের মধ্যে বেকারত্বের হার ছিল ৮.৪ শতাংশ এবং তফসিলি জাতির মধ্যে কর্মরত ৮৪ শতাংশই অসংগঠিত কর্মসংস্থানে যুক্ত ছিল – যা অন্যান্য সকল গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বোচ্চ। মোদী সরকার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষ উপাদান সংক্রান্ত পরিকল্পনা (স্পেশাল কম্পোনেন্ট প্ল্যান) কার্যকর করেনি। ২০১৯ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রকল্প তহবিলের মাত্র ১০.৬ শতাংশ তফসিলি জাতিদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। এই পরিমাণ বাধ্যতামূলক বরাদ্দ অর্থাৎ ১৫ শতাংশের চাইতে অনেক কম। এর মধ্যে মাত্র ৩.৩ শতাংশই নির্ধারিত লক্ষ্যের ৮০ শতাংশ প্রকল্পসমূহে ব্যবহৃত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এই সময়ের মধ্যে, দলিতদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে।

আদিবাসীদের উপরে আক্রমণ

২.৫৮ বিজেপি সরকার সংসদে নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ব্যবহার করে বিভিন্ন আইন ও বিধি সংশোধন করেছে যার ফলে আদিবাসীদের জন্য নির্ধারিত অপর্যাপ্ত সুরক্ষার উপরেও আঘাত নেমে এসেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্ব-শাসনের অধিকার। বন সংরক্ষণ আইন বিধির সংশোধনীর বয়ানে 'গ্রাম সভা' শব্দটিই বাদ দেওয়া হয়েছে। বন অধিকার আইন এবং খনি ও খনিজ সম্পদ উন্নয়ন আইন বিধির সংশোধন করে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য আদিবাসীদের তরফে সম্মতি পাওয়ার বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তাকেই বাতিল করা হয়েছে। গ্রাম সভার সম্মতি ছাড়াই খনির অনুসন্ধানের নামে বিভিন্ন বেসরকারি কোম্পানিগুলিকে অনুমতি দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এহেন সংশোধন করা হয়েছে। বহু জায়গায় আদিবাসীদের দখলে থাকা জমি অধিগ্রহণের জন্য জমির বিনিময়ে জমি দেওয়ার নীতিকে লঙ্ঘন করা হচ্ছে। এটি সংবিধানের পঞ্চম এবং ষষ্ঠ তফসিল এবং আদিবাসীদের জমি সুরক্ষিত রাখতে PESA-এর মতো বিধানগুলির স্পষ্ট লঙ্ঘন। জল, জঙ্গল ও জমির উপরে আদিবাসীদের মৌলিক অধিকার আজ তীব্র আক্রমণের সম্মুখীন। সরকারের নীতির কারণে বিপুলসংখ্যক আদিবাসীকে নিজেদের বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ হতে হচ্ছে। যেহেতু দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের বেশিরভাগই আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থিত, তাই এসমস্ত এলাকায় আদিবাসীদের অধিকার সুনিশ্চিত

রাখে এমন যেকোনো আইন কর্পোরেট স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়। সেই নিরিখে এই পরিস্থিতিকে কর্পোরেট বনাম আদিবাসীদের লড়াই বলা যায় এবং এমন অবস্থায় সরকার স্পষ্টভাবেই কর্পোরেটদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে।

২.৫৯ প্রতিরক্ষা, খনি, বিদ্যুৎ, সেচ ইত্যাদির মতো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের কারণে শক্তিশালী, নীতিহীন, অনিয়ন্ত্রিত বেসরকারি সংস্থাগুলি আদিবাসী এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে আসছে। বিভিন্ন আদিবাসী এলাকায় বেসরকারি প্রোমোটারদের দ্বারা অবৈধভাবে দখল করা জমিতে সরকার পর্যটন রিসর্ট তৈরির প্রচার চালাচ্ছে। বেসরকারিকরণের নীতি অনুসারে জমি অধিগ্রহণকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রকল্প তৈরির ধারণাকে কর্পোরেটদের সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত নীতিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। বেসরকারিকরণের নীতি আসলে যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ বাতিল করার নীতির সঙ্গে যুক্ত। এর সরাসরি প্রভাব পড়ে চাকরির উপর, কারণ বেসরকারি কোম্পানিগুলি নিজেদের প্রকল্পের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে চাকরির বন্দোবস্ত করে দিতে কোনোরকম নিশ্চয়তা দেয় না যেমনটি আগে নিয়ম ছিল। সুতরাং, বেসরকারি কোম্পানিগুলির দ্বারা নতুন খনি থেকে উত্তোলন ও অন্যান্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে আদিবাসীদের জমি এবং বনসম্পদের ক্ষতির জন্য তথাকথিত ক্ষতিপূরণ প্যাকেজের শর্তাবলী এইসকল কোম্পানিগুলির ইচ্ছানুযায়ী নির্ধারিত এবং বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৯ থেকে ২০২৪ সালের মার্চ মাসের মধ্যে শুধুমাত্র খনির কাজের জন্যই ১৮,৯৯২ হেক্টর বনভূমির চরিত্রে বদল করা হয়েছে।

২.৬০ বেসরকারিকরণের নীতির কারণে শিক্ষা এবং সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। এর পাশাপাশি শূন্যপদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাম্প্রতিক তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকারি বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট উদ্যোগসমূহে উপজাতি পরিচয়ের কর্মীদের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। সরকারি কাজে নিয়োগের ক্ষেত্রে উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত ২৫,০০০ চাকরি বাতিল করা হয়েছে। স্কুল শিক্ষায় ২০১৮ সালের তুলনায় ৩৫,০০০ কম উপজাতি শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। যাবতীয় চুক্তিভিত্তিক বা ঠিকা (আউটসোর্স) কাজে সংরক্ষণ বাড়াতে কেন্দ্রীয় সরকার অস্বীকার করেছে।

প্রতিবন্ধী মানুষের দুর্দশা বৃদ্ধির প্রসঙ্গে

২.৬১ নয়া-উদারনৈতিক ব্যবস্থা ভারতের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর শোচনীয় জীবনযাত্রার উপর বাড়তি ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করেছে। গত কয়েক বছর ধরে নোডাল বিভাগ এবং মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য কেন্দ্রীয় বাজেট বরাদ্দ কমবেশি স্থবিরই থেকেছে তাই না বরং বরাদ্দকৃত তহবিলের অপর্যাপ্ত ব্যবহারও লক্ষ্য করা গেছে। এর ফলে প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার ভিত্তিক আইন ও নীতির বাস্তবায়ন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশগত সঙ্কটের দিকে এগিয়ে চলার প্রসঙ্গে

২.৬২ বিজেপির নেতৃত্বাধীন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ভারতের পরিবেশ ও তার সাথে সম্পর্কিত জনসাধারণের অধিকার ও কল্যাণ আগের চেয়েও বেশি আক্রমণের শিকার হচ্ছে। বহুজাতিক কোম্পানি সহ লুটেরা পুঁজিপতি এবং বৃহৎ কর্পোরেশনগুলি বন এবং বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সহ পরিবেশের দিক থেকে সংবেদনশীল এলাকায় খনি, অনুসন্ধান এবং উত্তোলন শিল্প, অবকাঠামো এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্প্রসারণ করছে, যা বাস্তুতন্ত্রের পাশাপাশি উপজাতি, বনবাসী এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল অন্যান্যদের জীবন, আবাসস্থল এবং জীবিকাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বন্যপ্রাণীদের বসবাসের এলাকা সঙ্কুচিত হওয়ার কারণে মানুষ-প্রাণীর দ্বন্দ্ব বাড়ছে। এ ধরনের দ্বন্দ্ব প্রশমনে গৃহীত পদক্ষেপগুলি পরিকল্পিত ও সামগ্রিক অর্থে যথেষ্ট নয়। 'বাণিজ্যের জন্য সহজ পরিবেশ' গড়ে তুলতে বিজেপি'র প্রচেষ্টার অর্থ হল পরিবেশগত নিয়মকানুন ভেঙে ফেলা। এখনও পর্যন্ত সংরক্ষিত এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়ার সময় নিয়ামক সংস্থার সাথে প্রক্রিয়াগুলিকেই আগাগোড়া দুর্বল করে দেওয়া হয়েছে। গুনমানসম্পন্ন বনসম্পদ ব্যাপকভাবে হারিয়ে যাচ্ছে। এমন প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার মিথ্যা এবং ভুল তথ্য উপস্থাপন করে সত্য গোপন করছে। উন্নয়ন ও পর্যটনের নামে ভঙ্গুর পশ্চিম ও পূর্ব হিমালয় অঞ্চলে বিশাল পরিকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। জলবিদ্যুৎ ও সড়ক প্রকল্পগুলি অতিবৃষ্টির মতো জলবায়ুর প্রভাবকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এর প্রভাবে ঐ সমস্ত অঞ্চলে ভূমি ধস সহ শহর এলাকার মাটি বসে যাওয়া ও উপর্যপুরি বন্যার ঝুঁকির মুখোমুখি টেনে এনেছে। প্রতি বছর ঐ সমস্ত এলাকায় জীবন ও জীবিকার প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে। অপরিকল্পিত নগরায়ণ পরিবেশগত সমস্যাগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলছে।

২.৬৩ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দেশের জনজীবন এবং পরিকাঠামোর বিরাট ক্ষতিসাধন করছে। এর ফলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে, বারংবার বড় আকারের অর্থনৈতিক ক্ষতিও হচ্ছে। ভারত ক্রমশ আগের চাইতে আরও তীব্র এবং দীর্ঘমেয়াদী তাপপ্রবাহের সম্মুখীন হচ্ছে। নির্মাণ সহ অন্যান্য বাহ্যিক কাজে নিযুক্ত শ্রমিক, পথের উপর ছোট দোকানের বিক্রেতা, কৃষি শ্রমিক, গৃহকর্মী, গিগ শ্রমিক এবং অসংগঠিতরূপে বসবাসকারীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দেশের বেশিরভাগ অংশে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য প্রস্তুত নয়, এ সম্পর্কে দীর্ঘমেয়াদী কোনও ব্যবস্থার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়নি। কংক্রিট আচ্ছাদিত নগর পরিকাঠামোর তাপ-আবর্জনার প্রভাবের শহরাঞ্চলগুলি আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অপ্রতুল নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে তীব্র অতিবৃষ্টির প্রভাবে শহরাঞ্চলে প্রায় প্রতি বছর বন্যার পরিস্থিতি এখন সাধারণ ঘটনা। এমনকি মেট্রো শহরগুলিতেও এমনটা ঘটছে। এমন দুর্যোগে হাজার হাজার কোটি টাকার বিশাল ক্ষতি হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের অতিরিক্ত আর্থিক কেন্দ্রীকরণের নীতির সুবাদে

রাজ্য সরকার এবং শহরাঞ্চলের স্থানীয় সংস্থাগুলি এই দুর্যোগ মোকাবিলায় জরুরি তহবিলের অভাবে ভুগছে।

সংগ্রাম ও প্রতিরোধ প্রসঙ্গে

২.৬৪ কান্নুরে আয়োজিত পার্টি কংগ্রেসের পরবর্তী সময়ে ২০২৩ সালের ২৪ আগস্ট তারিখে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত শ্রমিক-কৃষকদের দেশব্যাপী যৌথ সম্মেলন একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ ছিল। এই আয়োজনে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা এবং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন যৌথ দায়িত্বে আয়োজন করে। ভারতের শ্রমিক ও কৃষকদের দাবির ভিত্তিতে একটি যৌথ দাবিসনদ গৃহীত হয়েছিল। সারা দেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও কৃষক ঐ বছরের ২৬ নভেম্বর থেকে ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত তিন দিনের জন্য সমস্ত রাজ্যের রাজধানীতে মহাপদবের সংগ্রামের আহবানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন বা সিটিইউ সমস্ত শিল্পক্ষেত্রে দেশব্যাপী ধর্মঘটের আহ্বান জানায়। সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার তরফে গ্রামীণ হরতাল দ্বারা ঐ আহ্বান সমর্থিত হয়। ২০২৪-এর ১৪ মার্চ দিল্লিতে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা এক বিশাল কৃষক সমাবেশ সংগঠিত করে। ঐ বছরই ২৬ নভেম্বর সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা ও সিটিইউ'র যৌথ আহবানে সারা দেশে জেলা পর্যায়ে এক বৃহৎ কর্মসূচি পালিত হয়।

২.৬৫ শ্রমিক-কৃষক যৌথ ও এমন বিস্তৃত উদ্যোগের পাশাপাশি, ট্রেড ইউনিয়ন, কিষাণ মোর্চা ও খেতমজুর ফ্রন্টের তরফে বেশ কয়েকটি যৌথ কর্মকাণ্ডে একে অন্যের সাথে সুসমন্বয় বজায় রেখে চলেছে। ২০২২ ও তার পরবর্তী সময়ে এই তিন ফ্রন্ট একযোগে কয়েক হাজার লোকের দেশব্যাপী বিশাল আকারের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছিল। এর মধ্যে ২০২২ এর ৫ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে একটি যৌথ জাতীয় সম্মেলন, ২০২৩-এর ৫ এপ্রিল দিল্লিতে আরেকটি সমাবেশ এবং ২০২৪ সালের ৯ থেকে ১৪ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্য পর্যায়ে মহাপদব এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ড চলে। উপরোক্ত সমস্ত যৌথ কর্মকাণ্ড শ্রমিক-কৃষক ঐক্যের লক্ষ্যকে কার্যকরীরূপে সাহায্য করেছে।

২.৬৬ এই সময়কালে ট্রেড ইউনিয়নের তরফে বেশ কয়েকটি সংগ্রাম সংগঠিত হয়। ইউনিয়ন গঠন এবং তার স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকারের দাবিতে তামিলনাড়ুতে স্যামসাং কোম্পানির শ্রমিকদের ৩৭ দিনের ধর্মঘট জয়ী হয়। বিদ্যুৎক্ষেত্রের বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, জম্মু ও কাশ্মীর, চণ্ডীগড় এবং পুদুচেরিতে বিদ্যুৎ শ্রমিক ও কর্মচারীরা ধর্মঘট করেন এবং আংশিকভাবে সফলও হন। অঙ্গনওয়াড়ি, আশা, মিড-ডে মিলের মতো স্কিম কর্মীদের দীর্ঘকালীন ধর্মঘট এবং বেশ কয়েকটি রাজ্যে বড় আকারের সমাবেশ আয়োজন করেন। এগুলির মধ্যে একাধিক ক্ষেত্রে আংশিক সাফল্য অর্জিত হয়। ব্যাঙ্ক, বিমা, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি কর্মচারী, ডাক, কয়লা, টেলিকম ও চিকিৎসা ক্ষেত্রের প্রতিনিধিরাও ধর্মঘট ও সংগ্রাম সংগঠিত করেছেন।

২.৬৭ কৃষক সংগঠনগুলি নির্দিষ্ট ফসল ফলানোর কাজে নির্দিষ্ট আন্দোলন পরিচালনা করেছে। চাষের ফসল বিক্রয় কেন্দ্রের জন্য সংগ্রাম করেছে, ফসল বিমা, জমির অধিকারের জন্য আন্দোলন সহ বন ও বন্যপ্রাণীর হুমকির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছে। রাবার চাষীদের সমর্থনে টায়ার-কার্টেলের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও আইনি লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। খেতমজুর ফ্রন্ট এমএনরেগা, মজুরি, জমি, আবাসন এবং বর্ণবৈষম্যের মতো বিভিন্ন ইস্যুতে বেশ কয়েকটি সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে। ২০২৩ সালের ১১ অক্টোবর লক্ষ লক্ষ খেত মজুর এমএনরেগার উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিগত আক্রমণের বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় প্রতিবাদ দিবসে অংশগ্রহণ করে। মূল্যবৃদ্ধি, গণবন্টন ব্যবস্থাকে (পি ডি এস) আরও সমর্থন করার দাবি সহ মহিলাদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অপরাধ ও সহিংসতার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি সংগ্রামে মহিলা ফ্রন্ট নেতৃত্ব দেয়। ২০২৩ সালের ৫ অক্টোবর দিল্লিতে সারা দেশ থেকে আগত হাজার হাজার মহিলারা একটি বিরাট সমাবেশ সংগঠিত করে। জাতীয় শিক্ষা নীতি (নিউ এডুকেশন পলিসি বা নেপ), শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ, ফি বৃদ্ধি ও স্কুল বন্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অগ্রভাগে ছাত্র ফ্রন্ট ছিল। ইউনাইটেড স্টুডেন্টস অফ ইন্ডিয়া নামে একটি যৌথমঞ্চ গঠিত হয়। এই মঞ্চ দিল্লি, চেন্নাই এবং কলকাতায় বৃহৎ সমাবেশ আয়োজন করে। বেকারত্ব, অগ্নিবীর প্রকল্প এবং অন্যান্য বিষয়ে যুব মোর্চা সক্রিয় ছিল।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অবস্থান প্রসঙ্গে

২.৬৯ বিজেপি– ফ্যাসিবাদী আরএসএস-এর রাজনৈতিক ফ্রন্ট হিসাবে বিজেপি গত এক দশকে প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এরা বৃহৎ বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণির প্রধান প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে এবং নিজেদের প্রতি সমর্থন আদায়ে তাদের সমর্থন বিশেষ করে বৃহৎ কর্পোরেটদের একত্রিত করেছে। বিজেপি'র একদিকে হিন্দুত্ববাদী আদর্শ আরেকদিকে বৃহৎ ব্যবসার মধ্যে জোট গড়ে তুলেছে এবং অভূতপূর্ব কায়দায় অর্থ ও মিডিয়া শক্তিকে ব্যবহার করে উভয়ের মধ্যে সঠিক সংহতি বজায় রেখেছে।

২.৭০ সামগ্রিক বিবেচনায় বলা যায় বিজেপি নির্বাচনে জয়ী হতে ত্রিমুখী কৌশল গ্রহণ করছে: (১) মেরুকরণ তৈরি এবং সর্ব-হিন্দু পরিচিতিকে সুসংহত করার উদ্দেশ্যে হিন্দুত্ববাদী ইস্যুগুলির আক্রমণাত্মক ব্যবহার, (২) নির্বাচনী লাভের জন্য জাতি ও বিভিন্ন বর্ণ পরিচিতির মানুষকে জোটের মধ্যে এনে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করা, এবং (৩) সুবিধাভোগীদের আকর্ষণ করার জন্য রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে সরাসরি নগদ হস্তান্তরের পরিকল্পনাকে কার্যকরীরূপে ব্যবহার। গত তিন বছরে অনুষ্ঠিত রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে রাজস্থান এবং ছত্তিশগড়ে বিজেপি নিজেদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে, তারা দু'রাজ্যেই কংগ্রেস সরকারকে উৎখাত করেছে। বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভের পর মধ্যপ্রদেশ সরকারও তারা ধরে

রেখেছে। কর্ণাটক এবং হিমাচল প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি হেরেছে, এই দু'টি তাদেরই সরকার ছিল। লোকসভা নির্বাচনের পর জম্মু ও কাশ্মীর ও ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনেও তারা পরাজিত হয়েছে।

২.৭১ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি বিপর্যস্ত হয়, তারা মাত্র ২৪০টি আসনে জয় পায়। তবে তাদের এমন ক্ষতির বিবেচনায় প্রেক্ষিতটি মনে রাখতে হবে। মোট ভোট প্রাপ্তির নিরিখে ২০১৯ সালের নির্বাচনের তুলনায় বিজেপি মাত্র ১.১ শতাংশ কম ভোট পেয়েছে। তারা বেশ কিছু নতুন রাজ্যে জয়ী হয়েছে। যেমন ওড়িশায় তারা লোকসভা নির্বাচনে ২১টির মধ্যে ২০টি আসনে জয়লাভ করে এবং প্রথমবারের মতো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনেও তারা জয়লাভ করেছে ও রাজ্য সরকার গঠন করেছে। দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে বিজেপির লাভ মূলত ভোটের হার বৃদ্ধি পাওয়া। লোকসভা নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে হরিয়ানায় বিজেপি এককভাবে এবং মহারাষ্ট্রে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোটের জয় প্রমাণ করে বিজেপি এখনও পুনর্গঠিত হতে এবং সংসদ নির্বাচনের সময় এই দুটি রাজ্যে যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল তাকে পিছনে ফেলে নিজেকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম।

২.৭২ একটি রাজনৈতিক দল হিসাবে বিজেপিকে গড়ে তোলার ভিত্তি যোগান দেয় আরএসএস। এই সময়ে মূল সংগঠন ও তার রাজনৈতিক ফ্রন্টের সমন্বয় ও যৌথ কর্মকাণ্ড আরও শক্তিশালী হয়েছে। মোদী-শাহ জুটির আধিপত্য অব্যাহত রয়েছে, দলীয় সংগঠনের সমস্ত ক্ষমতা তাদের হাতেই কেন্দ্রীভূত।

২.৭৩ কংগ্রেস– লোকসভায় নিজেদের শক্তিকে ৪৪টি আসন থেকে বাড়িয়ে ১০০-এ উন্নীত করতে কংগ্রেস সক্ষম হয়েছে। ইন্ডিয়া ব্লকের অন্তর্গত মিত্রদের তরফে পাওয়া সুবিধার জন্যই তারা এমন জয় পেয়েছে। সারা দেশে মুসলমান-সংখ্যালঘুদের সমর্থন উল্লেখযোগ্যভাবে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে কংগ্রেস। যদিও কংগ্রেসের ভিত্তি উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত হয়নি। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং উত্তরে হরিয়ানায় বিধানসভা নির্বাচনে তারা পরাজিত হয়েছে। পাঞ্জাব, ওড়িশা এবং আসামের মতো রাজ্যগুলিতে, তারা যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছে। দক্ষিণ ভারতে কংগ্রেস কর্ণাটক ও তেলেঙ্গানা বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করেছে এবং দুটি রাজ্যে সরকার গঠন করেছে।

২.৭৪ অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেস নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করেনি। তারা ধান্দার (ক্রোনি) ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা বলে, কিন্তু একই সাথে নয়া-উদারনীতি অনুসরণ করে। নয়া-উদারনীতিই এধরনের ক্রোনিদের জন্ম দেয়। কংগ্রেসের জাতীয় নেতৃত্ব হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডার বিরুদ্ধে আগের চাইতে অনেক বেশি স্পষ্ট অবস্থান নিলেও তারা এখনও দ্বিধাগ্রস্থ, বিজেপি ও তার হিন্দুত্ববাদী মিত্রদের আক্রমণের মুখোমুখি হলেই তাদের আপসের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। রাজনৈতিক দল হিসাবে কংগ্রেসও বিজেপি'র মতোই একই শ্রেণি স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। তবে প্রধান ধর্মনিরপেক্ষ বিরোধী দল হওয়ায় বিজেপি'র বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং

ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলির বৃহত্তর ঐক্যে তাদের ভূমিকা রয়েছে। কংগ্রেসের প্রতি সিপিআই(এম)-এর মনোভাব ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলির বৃহত্তর ঐক্য নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দ্বারাই নির্ধারিত হয়। যদিও কংগ্রেসের সাথে সিপিআই(এম)-এর কোনোরকম রাজনৈতিক জোট হতে পারে না।

২.৭৫ আঞ্চলিক দলসমূহ– আঞ্চলিক দলগুলিকে বিস্তৃতভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করা চলে। প্রথম ভাগে রয়েছে সেইসব দল যারা ধারাবাহিকভাবে বিজেপি'র বিরোধী। ডিএমকে, এসপি, আরজেডি, এনসিপি, এএপি এবং জেএমএম-এর মতো দল সেই অংশে থাকবে। দ্বিতীয় ভাগে এমন কিছু দল রয়েছে যারা বিজেপি'র সাথে জোটবদ্ধ এবং এনডিএ'তে রয়েছে, যেমন জেডি(ইউ), টিডিপি, জেডি(এস), এজিপি, জনসেনা সহ আরও কিছু ছোট দল। তৃতীয় ভাগে রয়েছে যারা বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতায় থাকাকালীন বিজেপি বা কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও বিরোধিতা করেনি, যেমন বিজেডি, এআইএডিএমকে এবং ওয়াইএসআরসিপি। বিআরএস শুরুর দিকে কেন্দ্রের প্রতি সমর্থন জানালেও পরে তেলেঙ্গানায় বিজেপি'র হুমকি উপলব্ধি করার সাথে সাথে তারা নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করেছিল। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনের পর এই তিনটি দলই নিজেদের ক্ষমতা হারিয়েছে।

২.৭৬ পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস একটি স্বৈরাচারী দল যা এক অপরাধী-দুর্নীতিবাজ-রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের আঁতাতের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। এদের কমিউনিস্ট বিরোধিতার রাজনীতি তীব্র। এটি নির্বাচনী কৌশল হিসাবে বিজেপি'র বিরোধিতা করে, সিপিআই(এম) সহ বামপন্থীদের প্রান্তিক করে তুলতে তৃণমূল বনাম বিজেপি'র দ্বিমুখী লড়াইকে বজায় রাখার চেষ্টা করে।

২.৭৭ বিজেপি বিরোধী বৃহত্তর বিরোধী ঐক্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক দলগুলির আগেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এবং আগামী দিনগুলিতেও তারা সে ভূমিকা পালন করে যাবে।

২.৭৮ জামাত-ই-ইসলামি এবং এসডিপিআই (পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়ার রাজনৈতিক শাখা)-র মতো মুসলমান মৌলবাদী এবং চরমপন্থী সংগঠনগুলি সংখ্যালঘু জনসাধারণের মধ্যে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের জন্য কাজ করছে। হিন্দুত্ববাদী শক্তির হাতে ক্রমাগত আক্রমণের শিকার হওয়ার ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যেকার বিচ্ছিন্নতা এবং ভয়কে তারা নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাতে চায়। কেরালায় তারা সংখ্যালঘুদের মধ্যে সিপিআই(এম)-এর প্রভাব রোধ করার জন্য আমাদের পার্টিকে নিশানা করে। যদিও সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতাকে ক্ষমতায় থাকা হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির সাথে তুলনা করা যায় না, তাহলেও এটা বুঝতে হবে যে সংখ্যালঘুদের মধ্যে থেকে উগ্র মৌলবাদী কার্যকলাপ সংখ্যাগরিষ্ঠ সাম্প্রদায়িকতার শক্তিকেই শক্তি যোগান দেয়। বাম এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির তরফে সংখ্যালঘুদের অধিকার দৃঢ়ভাবে রক্ষা করা উচিত। মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার সময় তাদেরকেও ধর্মনিরপেক্ষ মঞ্চে একত্রিত করা উচিত।

হিন্দুত্বের প্রতিরোধ প্রসঙ্গে

২.৭৯ হিন্দুত্ব এবং আরএসএস'র বিভিন্ন সংগঠনের কার্যকলাপের প্রভাব মোকাবিলায় রাজনৈতিক, আদর্শগত, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি পরিচালনার জন্য দলকে প্রস্তুত থাকতে হবে। আরও একবার একথা মনে রাখতে হবে যে শুধুমাত্র নির্বাচনী লড়াইয়ের মাধ্যমেই বিজেপি-আরএসএস'কে বিচ্ছিন্ন ও পরাজিত করা যাবে না। গত এক দশকে হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলি তাদের আদর্শগত প্রভাবের উপর ভিত্তি করে একটি উল্লেখযোগ্য সমর্থনের ভিত্তি তৈরি করেছে। তাই হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি থাকা প্রয়োজন।

২.৮০ এর জন্য, পার্টি এবং গণসংগঠনগুলিকেঃ

১) নিজেদের যাবতীয় বৌদ্ধিক সম্পদকে একত্রিত করতে হবে এবং এমনসব প্রচার সামগ্রী প্রস্তুত রাখতে হবে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে যাতে হিন্দুত্ববাদী শক্তির ক্ষতিকারক প্রচার ও কার্যকলাপ সকলের সামনে উন্মোচিত হয়।

২) হিন্দুত্ববিরোধী প্রচার ও সেই লক্ষ্যে পরিচালিত সংগ্রামগুলিকে আর্থিক নীতি ও মানুষের রুটিরুজির লড়াই-সংগ্রামের সাথে একীভূত করতে হবে।

৩) শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে, তাদের আবাসিক এলাকায় পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির দ্বারা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী কাজ সংগঠিত করার জন্য বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

৪) ইতিহাস পুনর্লিখনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, শিক্ষা ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িক বিষয়বস্তুর প্রবর্তন রুখতে হবে।

৫) ধর্মীয় আস্থা এবং রাজনৈতিক লক্ষ্যে ধর্মের অপব্যবহারের মধ্যেকার পার্থক্যকে ব্যাখ্যা করার জন্য ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে কাজ করতে হবে। জনমানসে সাম্প্রদায়িকীকরণ প্রতিহত করার জন্য বিভিন্ন উৎসব ও সামাজিক সমাবেশে হস্তক্ষেপ করতে হবে।

৬) মনুবাদী ও অলৌকিক উপলব্ধির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ড, জনপ্রিয় বিজ্ঞান আন্দোলন, ধর্মনিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা এবং জনজীবনে বিস্তৃত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডগুলিতে অংশগ্রহণ করতে হবে।

সিপিআই(এম)-এর নিজস্ব শক্তিবৃদ্ধির প্রসঙ্গে

২.৮১ অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনায় দলের স্বাধীন শক্তি সম্প্রসারণের জরুরি প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ করছে দলের গণভিত্তি ও প্রভাব বৃদ্ধি পায়নি। একে অর্জনের জন্য, নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করতে হবে:

১) বুনিয়াদী শ্রেণির মধ্যে পার্টির কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। গ্রামাঞ্চলে

ধনীদের হাতে দরিদ্র মানুষের শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে হবে। যেসব বিষয়ের উপর এ ধরনের সংগ্রাম পরিচালিত হতে পারে, সেসব বিষয়ে সুনির্দিষ্ট গবেষণা হওয়া উচিত। সংগঠিত ক্ষেত্রে, উৎপাদনমূলক এবং স্ট্র্যাটেজিক শিল্পক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে পার্টির প্রভাবকে সম্প্রসারিত করতে হবে। সংগঠিত ক্ষেত্রের চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদেরও সংগঠিত করার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে ঐক্য এবং ঐক্যবদ্ধ কর্মকাণ্ড গড়ে তুলতে পার্টির মনোযোগ দেওয়া উচিত। বুনিয়াদী শ্রেণির মধ্যে হিন্দুত্ব-বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা এবং ঐ সংগ্রামের ময়দানে যারা জড়ো হচ্ছেন তাদের রাজনীতিকরণের জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা উচিত।

২) পার্টি পরিচালিত রাজনৈতিক মঞ্চকে কেন্দ্র করে স্বাধীন রাজনৈতিক প্রচার এবং গণসংহতির প্রতি পার্টির আরও মনোযোগ দেওয়া উচিত। নির্বাচনী সমঝোতা বা জোটের নামে আমাদের স্বাধীন পরিচয়কে অস্পষ্ট করা বা আমাদের স্বাধীন কার্যকলাপকে হ্রাস করা উচিত নয়। আরএসএস-হিন্দুত্ববাদী শক্তির মতাদর্শ ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আদর্শগত কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও প্রচারের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত।

৩) স্থানীয় স্তরে সংগ্রামের জন্য গণ ও শ্রেণিগত বিষয়গুলিকে দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে বিবেচনার গুরুত্বের প্রতি জোর দেওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে কোনোরকম অলস মনোভাব নিয়ে চলার নীতি বর্জন করা উচিত। উচ্চতর কমিটিগুলিকে স্থানীয় ইউনিট এবং শাখাগুলিকে এই লক্ষ্যে পরিচালিত করা উচিত। প্রতিবাদ জানাতে ইতিমধ্যে বহু ব্যবহৃত কৌশল গ্রহণের পরিবর্তে আন্দোলন ও সংগ্রাম গড়ে তোলার কাজে সৃজনশীল ও নতুন চিন্তাভাবনার ফর্ম ব্যবহার করা উচিত।

৪) সামাজিক, বর্ণগত নিপীড়ন এবং লিঙ্গ বৈষম্যের বিষয়ে সরাসরি পার্টির তরফে প্রচার ও সংগ্রাম পরিচালনা করা উচিত। সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামগুলিকে শ্রেণিশোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাথে যুক্ত করা উচিত।

৫) দলের রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে এবং দাবিসনদের মধ্যে যুবসমাজের সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে তুলে ধরা উচিত এবং 'সমাজতন্ত্রই বিকল্প' জাতীয় প্রচার আন্দোলনের অভিমুখ বিশেষভাবে তাদের উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিত।

৬) পার্টির তাৎপর্যপূর্ণ শক্তি বৃদ্ধির জন্য পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় দল ও বামপন্থীদের পুনর্গঠন, সম্প্রসারণ প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে গণসংগ্রাম ও আন্দোলন পরিচালনা করার সময় গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের মধ্যে কাজ করা এবং তাদের সংগঠিত করার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। তৃণমূল এবং বিজেপি উভয়ের বিরোধিতা করে বিজেপি'র বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও আদর্শগত লড়াইয়ের প্রতি পার্টিকে বেশি মনোযোগ দিতে হবে। ত্রিপুরায় পার্টি সংগঠনকে একেবারে ভূমিস্তর থেকে শক্তিশালী করা উচিত এবং এমন এক কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত যা শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করবে, উপজাতি জনগণের বিশেষ চাহিদা ও সমস্যাগুলিরও সমাধান করবে।

৭) কেরালা হল পার্টির সবচেয়ে বড় ইউনিট যার একটি শক্তিশালী গণভিত্তি রয়েছে। একটানা দ্বিতীয়বারের জন্য এলডিএফ সরকার নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বৈরীতার মনোভাব এবং সে রাজ্যের সকল কমিউনিস্ট-বিরোধী শক্তির সম্মিলিত প্রচারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ করছে। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল বিজেপি'কে মোকাবিলায় আমাদের রাজনৈতিক ও আদর্শগত কাজের দুর্বলতাকে তুলে ধরেছে। এই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা উচিত। চরম দারিদ্র দূর করতে, সকলের জন্য আবাসন প্রদানে এলডিএফ সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে রাজ্য সরকারকে আর্থিক সঙ্কটের মুখোমুখি হতে হচ্ছে, তবুও সরকার দরিদ্র ও শ্রমজীবী মানুষের জন্য কল্যাণমূলক পদক্ষেপজনিত ব্যয়কেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

বামপন্থীদের ঐক্য প্রসঙ্গে

২.৮২ লোকসভা নির্বাচনে বৃহত্তর ঐক্য গঠনের ব্যস্ততার কারণে ঐ পর্বে ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী কর্মকাণ্ডে কিছুটা স্থবিরতা দেখা দেয়। গাজায় ইজরায়েলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য বামদলগুলি দু'বার যৌথ আহ্বান জানায়। বিকল্প নীতিসমূহ তুলে ধরার জন্য বামপন্থীদের ঐক্য ও ঐক্যবদ্ধ কর্মকাণ্ডের জন্য নতুন করে জোর দিতে হবে। জাতীয় রাজনীতিতে বামপন্থীদের ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপ মোদী সরকারের বিভাজনমূলক ও ক্ষতিকারক নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে আরও শক্তিশালী করবে।

বাম ও গণতান্ত্রিক বিকল্প

২.৮৩ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে পরের পর কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে নয়া-উদার ও বৃহৎ বুর্জোয়া-জমিদারপন্থী নীতি অনুসৃত হয়ে আসছে। গত এক দশকে কেন্দ্রের ক্ষমতা বিপজ্জনক কর্পোরেট-সাম্প্রদায়িক-কর্তৃত্ববাদী দক্ষিণপন্থী রাজনীতির হাতে রয়েছে। কেন্দ্রের ক্ষমতায় এহেন দক্ষিণপন্থী পটপরিবর্তনের পরে আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে বর্তমান বুর্জোয়া-জমিদার শাসনের বিরুদ্ধে একমাত্র প্রকৃত বিকল্প হলো বাম এবং গণতান্ত্রিক বিকল্প। সিপিআই(এম) তেমনই এক বাম এবং গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট তৈরির চেষ্টা করবে, যা শ্রমিকশ্রেণি, কৃষক, কারিগর, ছোট দোকানদার, মধ্যবিত্ত এবং বিদ্বজ্জনদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে ও তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে। বিকল্প নীতির বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদী গণআন্দোলন ও শ্রেণিসংগ্রামের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী বাম এবং গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করাই পার্টির জন্য অগ্রাধিকার।

২.৮৪ বাম ও গণতান্ত্রিক বিকল্প কর্মসূচিতে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি থাকা উচিত:

১) সাংবিধানিক বিধিতে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এর জন্য:

ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ দেশের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
গণতান্ত্রিক অধিকার এবং নাগরিক স্বাধীনতাকে খর্ব করে এমন আইনসমূহের অপসারণ।
কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক পুনর্গঠন এবং গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণকে কার্যকরী করা।
২) স্বনির্ভর এবং জনস্বার্থবাহী উন্নয়নের জন্য:
আন্তর্জাতিক পুঁজির চলাফেরায় কঠোর নিয়ন্ত্রণ; খনি ও প্রাকৃতিক তৈল সম্পদের জাতীয়করণ; পরিকল্পিত উন্নয়ন এবং আর্থিক বৃদ্ধির ভারসাম্য বজায় রাখা।
অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য হ্রাস; একচেটিয়া পুঁজির উপরে নিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের প্রসার; সম্পদের পুনর্বণ্টনে কোষাগারীয় ও কর ব্যবস্থার উপযুক্ত পদক্ষেপ।
ভূমি সংস্কার এবং কৃষি সম্পর্কের গণতান্ত্রিক রূপান্তর; সমস্ত ফসলে পারিশ্রমিকের নিরিখে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ব্যবস্থার আইনি আওতায় নিয়ে আসা; কৃষকদের ঋণ মকুব করা; খেত মজুরদের জন্য কেন্দ্রীয় আইনের মাধ্যমে মজুরি ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; সমবায়মূলক কৃষি উৎপাদন এবং বিপণনের মতো যৌথ হস্তক্ষেপের ভিত্তিতে কৃষিব্যবস্থার বিকাশ সাধন।
৩) শ্রমজীবীদের অধিকার প্রসঙ্গে:
জীবিকার অধিকার, স্থায়ী কাজ ও নিয়মিত মজুরির কর্মসংস্থান, ন্যায্য মজুরি, বাসস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তা; গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের স্বীকৃতি; সংস্থার পরিচালকমণ্ডলীতে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব, নয়া চারটি শ্রম কোড বাতিল।
খাদ্য সহ সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের জন্য গণবণ্টন ব্যবস্থাকে সর্বজনীন ও সম্প্রসারিত করা।
৪) শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে:
শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করা, জিডিপি'র ৬ শতাংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করা; জনশিক্ষার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ তাকে শক্তিশালী করা; আইসিডিএস'কে সর্বজনীন করা।
রাষ্ট্রীয় তহবিলের মাধ্যমে সর্বজনীন জনস্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা গড়ে তোলা; অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের দাম কমানো।
ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রচার এবং সংবিধানের অষ্টম তফসিলে তালিকাভুক্ত সকল ভাষার সমতা।
৫) সামাজিক ন্যায় প্রসঙ্গে:
বর্ণপ্রথা ও যাবতীয় বর্ণগত নিপীড়নের বিলোপ সাধন; দলিত, আদিবাসী এবং সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা।
সকল ক্ষেত্রে মহিলাদের সমান অধিকার; সমান কাজের জন্য সমান মজুরি এবং মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ দমনে কঠোর ব্যবস্থা।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুনিশ্চিত করা, যৌন পরিচিতির নিরিখে সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা করা।

৬) নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সংস্কার ও পরিবেশ প্রসঙ্গে:

বিরাট আকারের দুর্নীতি রোধে কঠিন ব্যবস্থাগ্রহণ; নির্বাচনী সংস্কার, আংশিক তালিকার ব্যবস্থা সহ আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের প্রবর্তন করা।

পরিবেশ দূষণ রোধে সুরক্ষার ব্যবস্থা, বিষাক্ত গ্যাস নির্গমন হ্রাস; পুনর্ব্যবহারযোগ্য জ্বালানির প্রচার; জ্বালানির নিরিখে সকলের জন্য সমতার অধিকার নিশ্চিত করা।

৭) বিদেশনীতি:

সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের বিরোধিতাকে ভিত্তি করে একটি স্বাধীন বিদেশনীতি নীতি গ্রহণ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যাবতীয় স্ট্র্যাটেজিক ও প্রতিরক্ষা চুক্তি বাতিল করা।

রাজনৈতিক লাইন

২.৮৫ প্রায় এগারো বছর যাবৎ মোদী সরকারের শাসনে দক্ষিণপন্থী, সাম্প্রদায়িক ও কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক শক্তিগুলি নয়া-ফ্যাসিবাদী বৈশিষ্ট্য সমেত একীভূত হয়েছে। মোদী সরকার হিন্দুত্ববাদী শক্তি এবং বৃহৎ বুর্জোয়াদের জোটের প্রতিনিধিত্ব করে। অতএব, বিজেপি-আরএসএস এবং এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকারী হিন্দুত্ববাদী-কর্পোরেট জোটের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং পরাজিত করাই পার্টির প্রধান কর্তব্য।

২.৮৬ বিজেপি ও হিন্দুত্ববাদী শক্তিসমূহকে বিচ্ছিন্ন ও পরাজিত করার জন্য হিন্দুত্ববাদী আদর্শ এবং সাম্প্রদায়িক শক্তির কার্যকলাপের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম প্রয়োজন। হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সকল ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির ব্যাপকতম সংহতি ঘটানোর জন্য পার্টিকে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

২.৮৭ হিন্দুত্ববাদী নয়া-উদারবাদী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাফল্যের জন্য সিপিআই(এম) সহ বামপন্থী শক্তিগুলির স্বাধীন শক্তির বৃদ্ধি প্রয়োজন। এর জন্য হিন্দুত্ববাদী-সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং নয়া-উদারনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের একীকরণ ঘটানো প্রয়োজন।

২.৮৮ মোদী সরকার ও বিজেপি'র বিরুদ্ধে লড়াইকে অবশ্যই কর্পোরেট-পন্থী, নয়া-উদারবাদী নীতির বিরুদ্ধে শ্রেণিসংগ্রাম ও গণআন্দোলন পরিচালনা করতে হবে। এই শাসন শ্রমজীবী মানুষের উপরে শোষণকে তীব্রতর করেছে, তাদের জীবিকা ও জীবনযাত্রার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। ধান্দার ধনতন্ত্র, জাতীয় সম্পদের লুঠ ও বৃহত্তর পরিসরে বেসরকারিকরণের বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে পার্টিকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

২.৮৯ ইন্ডিয়া ব্লকের অন্তর্গত রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে সর্বসম্মত বিষয়গুলিতে সংসদের ভিতরে ও বাইরের লড়াইতে পার্টি সহযোগিতা করবে। গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কর্তৃত্ববাদী আক্রমণ, মতবিরোধকে দমনের জন্য কঠোর আইনের ব্যবহার

এবং সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করার চেষ্টার বিরোধিতায় সকল ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তির সাথে পার্টি হাত মিলিয়ে চলবে।

২.৯০ যেসমস্ত আঞ্চলিক দল বিজেপি'র তীব্র বিরোধিতা করছে পার্টি তাদের সাথে সহযোগিতা করবে। যেখানে এধরনের আঞ্চলিক দলগুলি রাজ্য সরকার পরিচালনায় সেখানে জনগণের কল্যাণে কাজ করলে সেই সকল নীতিকে পার্টি সমর্থন করবে। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে এমন যে কোনও নীতির বিরুদ্ধে জনগণকে পার্টি সংগঠিত করবে ও সেসবের বিরোধিতা জানাবে।

২.৯১ শ্রেণিসংগঠন ও গণসংগঠনের ঐক্যবদ্ধ করে মঞ্চ গড়ে সমবেত কর্মকাণ্ডকে পার্টি সমর্থন করবে। বুর্জোয়া দলগুলির অনুসরণকারী জনগণকে ঐক্যবদ্ধ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আকৃষ্ট করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো উচিত।

২.৯২ পার্টির স্বাধীন শক্তি বিকাশকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পাশাপাশি বামপন্থীদের ঐক্যকে পুনরুজ্জীবিত ও শক্তিশালী করার প্রচেষ্টাও করা উচিত। ঐক্যবদ্ধ প্রচার এবং সংগ্রামে বামপন্থী বিকল্প নীতিগুলি তুলে ধরতে হবে। পার্টির উচিত গণসংগঠন এবং সামাজিক আন্দোলন সহ সমস্ত বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে একত্রিত করে বাম এবং গণতান্ত্রিক মঞ্চ তার কর্মসূচি গঠনের জন্য কাজ করা।

২.৯৩ বিজেপি-বিরোধী ভোটকে সর্বাধিক সংখ্যায় একজায়গায় টেনে আনতে উপরে বর্ণীত রাজনৈতিক লাইন অনুসারে উপযুক্ত নির্বাচনী কৌশল গ্রহণ করা যেতে পারে।

করনীয় কাজ

২.৯৪ (১) নয়া-উদারবাদী অর্থনৈতিক নীতি, হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িকতা এবং গণতন্ত্রের উপর কর্তৃত্ববাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে পার্টির প্রচার এবং সংগ্রাম আরও জোরদার করা উচিত।

(২) জীবিকা নির্বাহের বিষয়, জমি, খাদ্য, মজুরি, গৃহস্থালির জায়গা, সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রসঙ্গে গ্রামের দরিদ্র মানুষ, শ্রমিকশ্রেণি ও শহরাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের সংগ্রামকে আরও বিকশিত এবং তীব্র করা উচিত।

(৩) হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সকল ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক শক্তির বিস্তৃততম ঐক্যের জন্য পার্টির প্রচেষ্টা করা উচিত।

(৪) গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক অধিকার এবং নাগরিক স্বাধীনতার সুরক্ষার জন্য ধারাবাহিক আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনা করা উচিত। ভিন্নমত ও বিরোধিতা দমনের জন্য কর্তৃত্ববাদী আক্রমণ, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির অপব্যবহার, সাংবিধানিক সংস্থাগুলিকে ধ্বংসের বিরুদ্ধে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলতে পার্টির সহযোগিতা করা উচিত।

(৫) সমস্ত ধরণের বর্ণগত নিপীড়ন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে পার্টির সক্রিয়ভাবে লড়াই করা

উচিত। মহিলা, দলিত, আদিবাসী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা করা উচিত। উপজাতি এলাকায় কাজ করার জন্য পার্টির বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত।

(৬) ভারতের জনমানসে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনা জাগিয়ে তোলার জন্য, মোদী সরকারের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘেঁষা বিদেশনীতি সহ তাদের সাথে স্ট্র্যাটেজিক জোটের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার জন্য পার্টির কাজ করা উচিত।

(৭) রাজ্যগুলির অধিকার এবং দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে সুরক্ষিত রাখার পক্ষে পার্টির শক্তি সংগ্রহ করা উচিত। কেরালায় এলডিএফ সরকারকে সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব পার্টিকে নিতে হবে, জনস্বার্থবাহী নীতিসমূহের বাস্তবায়নের জন্য তাদের প্রচেষ্টাকে পার্টির তরফে সমর্থন করতে হবে।

(৮) বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের জন্য পার্টিকে সক্রিয় হতে হবে। এবং একটি বিকল্প হিসাবে বাম ও গণতান্ত্রিক কর্মসূচিকে তুলে ধরা করা উচিত। সেই সঙ্গে একে যুক্ত করতে হবে সমাজতন্ত্রই বিকল্প এই প্রচারাভিযানের সঙ্গে – এমন এক সমাজতন্ত্র, যা ভারতের পরিস্থিতির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ হবে।

চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলায় উঠে দাঁড়ান

২.৯৫ উপরোক্ত কর্তব্যসমূহ সম্পন্ন করতে পার্টির স্বাধীন শক্তিকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা অত্যন্ত অপরিহার্য।

রাজনৈতিক, আদর্শগত, সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিকভাবে পার্টিকে বিজেপি-আরএসএসের মুখোমুখি হতে হবে।

নয়া উদারনৈতিক ব্যবস্থার অধীনে চলা শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিক, কৃষক, গ্রামীন মজুর-সহ শ্রমজীবী মানুষের অন্যান্য সকল অংশের সংগ্রামকে দৃঢ়তার সাথে পরিচালনা করতে হবে।

জনগণের সামনে প্রকৃত বিকল্প উপস্থাপনের জন্য সমস্ত বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে সাথে নিয়ে পার্টিকে এগোতে হবে।

২.৯৬ এখন সমগ্র পার্টি এই প্রস্তাবের রাজনৈতিক ও আদর্শগত বার্তাকে ভারতের জনগণের কাছে পৌঁছে দিক! আসুন, আমরা জনগণের মধ্যে গভীর শিকড় বিস্তারকারী এক শক্তিশালী সর্বভারতীয় দল গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে চলি! কমিউনিস্ট আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে উদ্ভূত বাধাসমূহের মোকাবিলা করার জন্য আমরা উঠে দাঁড়াবোই, এই আমাদের আত্মবিশ্বাস!